POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পোঁছাইয়া দেওয়া।

(মায়েদা: ৯৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 44

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

4 নভেম্বর , 2021 ● 28 রবিউল আওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গালের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম।

সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া সদকা হিসেবে দেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বিক্রি হতে দেখে নিজেই কিনে নিতে চান। তিনি (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিজের সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নিও না।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১লা অক্টোবর, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়, খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না।
মানুষ যেহেতু সে এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদাতে বিলীন ব্যক্তির মর্যাদা

খোদা তা'লার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খোদাতে বিলীন হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা সেই সব কাজ সম্পাদিত হয় যেগুলিকে ঐশী ক্রিয়াকলাপ বলা হয়। এমন ব্যক্তির উপর অতি উচ্চ মানের জ্যোতি প্রকাশিত হতে থাকে। মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়, খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর মানুষ পরনের কাপড়টাও ঠিক করতে সক্ষম নয়। চিকিৎসগণ একটি ব্যধির কথা উল্লেখ করেছেন যাতে একটি হাঁচিই মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। নিশ্চিত জেনে রেখো! মানুষ সমূহ দুর্বলতার সমষ্টি আর এই কারণেই খোদা তা'লা বলেছেন- خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। (আননিসা: ২৯)। মানুষের নিজের বলতে কিছুই নেই। আপাদ মস্তক তার ততগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, যতগুলি রোগব্যধি দ্বারা সে আক্রান্ত হয়। মানুষ যেহেতু এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া। এবং এর জন্য সততা অবলম্বন করা আবশ্যক। ভৌতিক তন্ত্রও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা সততার পন্থা ত্যাগ করে অসাধুতার পথ বেছে নেয়, এবং মনে করে মিথ্যার আশ্রয় তাদেরকে পাপের পরিণতি থেকে রক্ষা করবে,তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত।

মিথ্যার আশ্রয় নিলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

ক্ষণস্থায়ীভাবে মানুষ কিছুটা লাভ দেখতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে যায়, যদি সে মিথ্যার পথ বেছে নেয়, এবং ভিতর ভিতর তাতে ঘুনে খেয়ে নেয়। তখন একটি মিথ্যার কারণে তাকে বহু মিথ্যা উদ্ভাবন করতে হয়। কেননা সেই মিথ্যাটির উপর সত্যের প্রলেপ দিতে হয়। এভাবেই ভিতর ভিতর তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করে। তখন সে এতটাই ধৃষ্ট ও উদ্ধত হয়ে ওঠে যে খোদা তা'লার নামেও মিথ্যা রচনা করতে শুরু করে এবং খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদেরকেও প্রত্যাখ্যান করে। এইরূপে সে খোদার দৃষ্টিতে সব চায়তে বড় অত্যাচারী বিবেচিত হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ (আল আনআম, আয়াত: ২১) অর্থাৎ সেই ব্যক্তির থেকে বড় অত্যাচারী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে কিম্বা তাঁর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় জেনে রেখো! মিথ্যা ভয়ানক মন্দ বিষয়, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যার কারণে মানুষ খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও তাঁর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। মিথ্যার পরিণতি এর থেকে ভয়ানক আর কি হতে পারে? অতএব, সত্যের পথ অবলম্বন কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

মানুষের জীবন যদি ইহজগতেই শেষ হয়ে যেত, তবে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করেছেন মানুষ যেন সে এই পৃথিবীতে কিছুকাল ভোগবিলাস করার পর মৃত্যুবরণ করে। এমন চিন্তাধারা একেবারেই অযৌক্তিক।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর- এর ৮৬ আয়াত

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ
وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন-অর্থাৎ যমীন ও আসমানের সৃষ্টির বিষয়ে ভেবে দেখ! দেখে কি মনে হয় যে এগুলি কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে যে, এমন সুবিশাল ব্যবস্থাপনা কোন উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে এবং সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, 'সাআত' অর্থাৎ প্রতীক্ষিত সময় অবশ্যই আসবে। 'সাআত' শব্দটি কিয়ামত দিবসের জন্যও ব্যবহৃত হয়।এবং সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্তের জন্য ব্যবহৃত হয় যা নবীগণের শত্রুদের বিনাশ এবং তাঁদের মান্যকারীদের উন্নতির জন্য নির্ধারিত থাকে। আয়াতের প্রথমাংশ উভয় 'সাআত' -এর জন্য দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যমীন ও আসমানের সৃষ্টি কিয়ামতেরও দলিল আর এটি নবীদের সফলতা এবং

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: মেয়েদের মুখমণ্ডলের লোম ও ভ্রু উপড়ে ফেলা এবং শরীরে উল্কী তৈরী করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হুযুর আনোয়ার ২রা ফেব্রুয়রী ২০১৯ তারিখের চিঠিতে বলেন-

হাদীসে মোমেন মহিলাদেরকে নিজেদের শরীরে উল্কী তৈরী করা, মুখমণ্ডলের লোম তুলে ফেলা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং যুবতী দেখানোর জন্য সামনের দাঁতে ফাঁক তৈরী করা, কৃত্রিম পরচুলো লাগানো, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা প্রভৃতি বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

এই সব কাজের কারণে মানুষের বাহ্যিক পরিপাটিতে যদি এই ধরণের কৃত্রিম পরিবর্তন আসে, যার ফলে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে খোদা সৃষ্ট পার্থক্য মুছে যায় বা এই ধরণের কাজের কারণে শিরকের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়, যা সব থেকে বড় পাপ, তবে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া হাদীসে যেমন এই সব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি হুযুর (সা.) সতর্কও করেছেন যে, বনী ইসরাঈল সেই সময় ধ্বংস হয়েছিল যখন তাদের মহিলারা এই ধরণের কাজ করতে আরম্ভ করে। সুতরাং এথেকে প্রমাণ করা যায় যেহেতু ইহুদীদের মাঝে ব্যাভিচার ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই সেই সব কাজে লিপ্ত মহিলারা হয়তো পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে এই সব পন্থা অবলম্বন করত। এই কারণেই খোদার রসুল (সা.) এই সব কাজের কদর্যতা তুলে ধরে মোমেন মহিলাদেরকে এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া এও সম্ভব যে, হুযুর (সা.)-এর এই নির্দেশ তৎকালীন যুগের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ছিল, ঠিক যেমনটি হুযুর (সা.) একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইসলামগ্রহণকারী মানুষদের অতদঞ্চলে সুরা তৈরীতে ব্যবহৃত পাত্রের সাধারণ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা যখন ইসলামের শিক্ষা আত্মস্থ করে ফেলল, তখন তিনি সেই সব পাত্র ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

ইসলামের দাবি হল, কর্মের ফল নির্ভর করে উদ্দেশ্য বা সংকল্পের উপর। কাজেই এই যুগেও এই সব কাজের পরিণামে যদি কোন কদাচারের প্রতি আকর্ষণ জন্মে বা ইসলামের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ লাঞ্ছিত হয়, তবে সেই সেই কাজ হুযুর (সা.)-এর সতর্কবাণীর অধীনে বিবেচিত হবে। যেমনটি এযুগেও মহিলারা নিজেদের পরিচ্ছন্নতা কিম্বা ওয়াক্সিং-করার সময় যদি পর্দা মেনে না চলে এবং অন্যান্য মহিলাদের সামনে পর্দাহীনতা হয়, তবে তা নির্লজ্জতা, যার অনুমতি নেই। আর সম্ভবত সেই সব মহিলারা উপরোক্ত সতর্কবাণীর আওতায় পড়বে। কিন্তু পর্দা সংক্রান্ত ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে চলার পাশাপাশি যদি কোন মহিলা এই সব বিষয় থেকেও লাভবান হয়, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন: জনৈক আহমদী হুযুর আনোয়ারের নিকট প্রশ্ন করেন যে, একটি সফরে একাধিক উমরা করা কিম্বা উমরা করার পর বাকি সময় অন্যান্য ইবাদতে কাটানো- এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়? হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের লেখা চিঠিতে উত্তরে লেখেন-

আঁ হুযুর (সা.) এর সুন্নত থেকে প্রমাণিত যে হুযুর (সা.) একটি সফরে একবার মাত্র উমরা করেছেন। কিন্তু তিনি (সা.) একই সফরে একাধিক বার উমরা করতে কোথাও নিষেধ করেন নি। তাই কেউ যদি হুযুর (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে একটি সফরে একবারই উমরা করে এবং বাকি সময় অন্যান্য ইবাদত নিয়োজিত করে, তবে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু উমরাতেও আল্লাহ্ তা'লার ঘর তোয়াফ , সাফা এবং মারোয়া প্রদক্ষিণ, যিকরে ইলাহি এবং নফল পড়া হয়, তাই কেউ যদি একাধিক বার করতে চায় তাতেও কোনও অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা বিধবাদের ইদ্দত চলাকালীন লাজনাদের অনুষ্ঠানাদি, বা-জামাত নামাযের জন্য মসজিদে আসা কিম্বা নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে যাতায়াত প্রসঙ্গে জানতে চান। তিনি একথা লেখেন যে, বার্ধক্যে উপনীত মহিলাদের জন্য ইদ্দতের বিধিনেষধ থাকা উচিত নয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.). ২০১৯ সালের ২রা ফেব্রুযারীর চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন- বিধবাদের ইদ্দত -এর বিধিনিষেধ পরিবর্তনের পক্ষে আপনার চিঠিতে তালাকের পর নিকাহর প্রমাণ হিসেবে যে দলিল দিয়েছেন সেটি ভুল। (আপনার যুক্তিমতে কুরআন করীম অনুসারে তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে নিকাহ তখনই সম্ভব যখন সে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করার পর তাকে তালাক দেয়। কিন্তু এখন অন্য পুরুষকে বিয়ে না করেও প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। কাজেই যেভাবে এই আদেশের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের ক্ষেত্রেও মহিলার বয়সের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।) পূর্বেও এমন কোন আদেশ ছিল না, আর এতে কোন পরিবর্তনও হয় নি। বিষয়টি নিয়ে আপনি যেহেতু সম্যক অবগত নন, তাই দুটি ভিন্ন ভিন্ন আদেশকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

অনুরূপভাবে বিধবাদের ইদ্দত সম্পর্কেও আপনি ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নন। ইসলাম মহিলাকে স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিনের শোক পালনের অনুমতি দিয়েছে, এক্ষেত্রে কোনও প্রকারের ব্যতিক্রম নেই বা বয়সের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় নেই। কাজেই বিধবাদের জন্য ইদ্দতের সময়টুকু যথাসাধ্য বাড়িতে কাটানো আবশ্যক। এই সময়কালে সাজসজ্জা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হওয়ার অনুমতি নেই।

ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রী তার স্বামীর কবরে দোয়ার জন্য যেতে পারে। তবে শর্ত হল কবর সেই শহরেই হতে হবে যে শহরের সে বাস করে। তাছাড়া তাকে যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, তবে সেটিও বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। অনুরূপভাবে যদি কোন বিধবার পরিবার তার চাকুরী বা উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয় বা ছেলে মেয়েদের স্কুলে দিয়ে আসা এবং স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য, বাজার করার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে এগুলি সবই বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থা তার জন্য জরুরী হল সোজা কাজে যাওয়া এবং কাজ শেষ করে সোজা বাড়ি ফেরা। বাধ্যবাধকতা এবং প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হওয়ার এটিই সীমা। কোন সামাজিক সভা বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার অনুমতি নেই। অতএব, নিত্যনতুন বিষয় শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিত্যনতুন পন্থা উদ্ভাবন করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয় নি।

প্রশ্ন: একটি হাদীস সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট দিক-নির্দেশনা জানতে চাওয়া হয়, যে হাদীসে যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের ঝগড়া বিবাদ এবং দাম্পত্য কলহের নিষ্পত্তির জন্য মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২৮ শে জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে বলেন- কুরআন করীম এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসে মিথ্যাকে 'আকবারুল কাবায়ের' অর্থাৎ গুরুতর পাপগুলির মধ্যে সব থেকে প্রধান আখ্যায়িত করা হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আপনার চিঠিতে উল্লেখিত হাদীসটির মতই আরও একটি হাদীস সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর শব্দগুলি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। শব্দগুলি নিম্নরূপ-

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে মীমাংসা করানোর জন্য সৎ কথা বলে এবং পুণ্যের কথা প্রচার করে, সে মিথ্যাবাদী নয়।

এর উপমা এম, যে- মীমাংসাকারী ব্যক্তি একপক্ষের সম্পর্কে বলা অপরপক্ষের প্রশংসাসূচক কথাগুলি প্রথমপক্ষের সামনে বর্ণনা করে এবং সেই পক্ষের বিরুদ্ধে বলা কথাগুলি গোপন রাখে, এমন মীমাংসাকারী ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে না।

সুনানে তিরমিযি হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-

لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ-

অর্থাৎ তিনটি কথা ছাড়া মিথ্যা বলা বৈধ নয়। স্বামী নিজের স্ত্রীকে প্রীত করতে যখন কোন কথা বলে। যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা এবং মানুষের মাঝে বিবাদের নিষ্পত্তি করার সময় মিথ্যা বলা।

প্রথম কথা হল, সুনানে তিরমিযিতে বর্ণিত এই হাদীসটি কুরআন করীমের স্পষ্ট নির্দেশ এবং হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, ইসলাম মিথ্যাকে কোনও অবস্থাতেই বৈধ আখ্যা দেয় নি। এর বিপরীতে ইসলামের শিক্ষা হল প্রাণ থাকতে মিথ্যার আশ্রয় নিও না।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর যুগান্তরকারী রচনা 'নুরুল কুরআন নং-২ ' পুস্তকে জনৈক খৃষ্টানের এই একই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন-

'কুরআন করীম মিথ্যাকে মূর্তিপূজার সমকক্ষে বসিয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

বস্তুত হাদীসে কোনও ক্রমেই মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া হয় নি। হাদীসে বলা হয়েছে 'ইন কুতেলতা ও আহরাকতা'। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কোন হাদীস কুরআন করীম এবং সহীহ হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সেক্ষেত্রেও সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আমরা কেবল সেই হাদীসকেই গ্রহণ করি যা সহীহ হাদীস এবং কুরআন করীমের পরিপন্থী নয়। তবে কিছু হাদীসে 'তওরিয়া'=র বৈধতার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং এর প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে একেই মিথ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। (ক্রমশ....)

জুমআর খুতবা

হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খেলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের গণ্ডি দূর-দূরান্তের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বে জিহুন এবং সিন্ধু নদ থেকে নিয়ে পশ্চিমে আফ্রিকার ধূসর মরুভূমি পর্যন্ত আর উত্তরে এশিয়া মাইনরের (অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত তৎকালীন সাইলেসিয়া প্রদেশ) পাহাড় ও আর্মেনিয়া থেকে নিয়ে দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং নুবিয়া পর্যন্ত একটি বিশ্বময় বিস্তৃত দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

ফারামার যুদ্ধ, বিলবিস বিজয়, উমদুনায়েন বিজয়, ফুসতাতের যুদ্ধ, আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়, বারকা ও ত্রিপলি বিজয়ের ঘটনা। এছাড়া প্রাচ্যবিশারদদের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলার ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ।

বিপদ-আপদ আসে এবং সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য। উক্ত নীতিকে আমরা যদি আজও স্মরণ রাখতে চাই তবে এই সকল বিপদাপদ যা আমাদের ওপর আপতিত হয়েছে তা আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের কারণ হওয়া চাই আর পরবর্তিতে এগুলোই বিজয়ের মূল কারণ হয়ে থাকে। যদি এসব বিষয়ে আমরা শুধু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে থাকি এবং আত্মশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দিই তবে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। তবে বিপদাবলী যখন দূর হয়ে যাবে এবং উন্নতি সাধন হবে তখনও আমাদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকা উচিত। কিন্তু বর্তমানে আমাদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং আমাদেরকে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১লা অক্টোবর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১ ইখা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কোন এক উপলক্ষে এক বক্তৃতায় তবলীগ সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপন করছিলেন তখন হযরত উমর (রা.)-এর যুগের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের মাঝে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কম থাকত। সিরিয়ার যুদ্ধে বেশ সেনাসংকট ছিল।

হযরত আবু উবায়দা হযরত উমর (রা.)-কে লিখেন, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি তাই আরো সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। হযরত উমর (রা.) নিরীক্ষা করে দেখলেন নতুনভাবে সৈন্য ভর্তি করা অসম্ভব কেননা আরবের আশপাশের গোত্রগুলোর যুবকরা হয় নিহত হয়ে গিয়েছিল কিম্বা তাদের সবাই পূর্বেই সেনাবাহিনীতে ছিল। তিনি (রা.) পরামর্শের জন্য একটি সভার আয়োজন করেন এবং এ সভায় বিভিন্ন গোত্রের লোকদের আহ্বান জানিয়ে তাদের সামনে উক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তারা বলে, একটি এমন গোত্র আছে যেখানে কিছু লোক পাওয়া যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) একজন কর্মকর্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সেই গোত্রের যুবকদের একত্র করার নির্দেশ দেন। আর হযরত আবু উবায়দাকে লিখে পাঠান, তোমার সাহায্যে আমি ছয় হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছি। এই সৈন্যবাহিনী কিছুদিনের মধ্যেই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। এর মাঝে তিন হাজার লোক ওমুক ওমুক গোত্র থেকে তোমার কাছে যাবে এবং অবশিষ্ট তিন হাজারের সমান আমর বিন মা'দী কারবকে পাঠাচ্ছি।হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের কোন যুবককে যদি তিন হাজার লোকের মোকাবিলায় পাঠানো হয় তাহলে সে বলবে, এ কেমন কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত কথা!! খলীফার কি বিবেক লোপ পেয়েছে? একজন কি তিন হাজার লোকের মোকাবিলা করতে পারে! কিন্তু লক্ষ্য করুন, তাদের ঈমান কত দৃঢ় ছিল! হযরত আবু উবায়দা হযরত উমর (রা.)-এর পত্র পেয়ে তিনি উক্ত পত্র পাঠ করে সৈন্যদের বলেন, তোমরা আনন্দিত হও। কাল আমর বিন মা'দী কারেব তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবেন। সৈন্যরা পরদিন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আমর বিন মা'দী কারবকে স্বাগত জানায় এবং নারা উচ্চকিত করে। শত্রুরা মনে করে, মুসলমানদের সাহায্যের জন্য হয়তো এক লক্ষ বা দুই লক্ষ সৈন্য এসেছে আর একারণেই মুসলমানরা এত উদ্দীপ্ত। অথচ একা হযরত আমর বিন মা'দী কারব এসেছিলেন। পরে সেই তিন হাজার সৈন্যও পৌঁছে যায় আর মুসলমানরা শত্রুদের পরাস্ত করে অথচ তরবারির যুদ্ধে একজন মানুষ তিন হাজার লোকের মোকাবিলা কিভাবে করতে পারে! তিনি বলেন, বাকযুদ্ধে একজন মানুষ কয়েক হাজার লোকের কাছে নিজের কথা পেঁ ছাতে পারে কিন্তু তারা যুগ খলীফার কথাকে এতটাই গুরুত্ব দিত যে, হযরত উমর (রা.) আমর বিন মা'দী কারবকে তিন হাজার সৈন্যের স্থলাভিষিক্ত করে পাঠালে সৈন্যরা এই আপত্তি উত্থাপন করে নি যে, একা একব্যক্তি কীভাবে তিন হাজার লোকের মোকাবিলা করতে পারে। এই আপত্তি না করে তারা তাকে তিন হাজার লোকের সমতুল্যই জ্ঞান করেছে এবং অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ভাবে তাকে স্বাগত জানিয়েছে। এভাবে স্বাগত জানানোর ফলে শত্রুদের মন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে আর তারা মনে করে যে, সম্ভবত লক্ষ দুই লক্ষ সৈন্য মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসে গেছে। একারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পা হড়কে যায় আর তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তিনি (রা.) বলেন, আমাদেরও আপাতত এভাবেই নিজেদের মনকে আশ্বস্ত করতে হবে।"

(স্পেন অউর সিসিলি মেঁ তবলীগে ইসলাম অউর জামাতে আহমদীয়া, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৩৫৯-৩৬০)

ইউরোপের স্পেন ও সিসিলী প্রভৃতি স্থানে তবলীগের পন্থা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করেন। এখন মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের উল্লেখ করবো। এর মধ্যে একটি যুদ্ধের নাম ছিল ফারামার যুদ্ধ। ফারামা মিশরের একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল। এটি ভূমধ্যসাগর ও পালুজির (মুখের) নিকটবর্তী এক পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, যা নীল নদের শাখাগুলির একটি শাখা।

(সৈয়্যদানা হযরত ফারুক আযাম, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৫৫৬-৫৫৭, ইসলামী কুতুব খানা উর্দু বাজার, করাচি)

আল্লামা শিবলী নোমানীর মতে, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আসের অনুরোধেহযরত উমর (রা) হযরত আমর বিন আসকে চার হাজার সৈন্যসহ মিশর অভিমুখে প্রেরণ করেন, কিন্তু একই সাথে এ নির্দেশও দেন, যদি মিশর পৌঁছার পূর্বে আমার পত্র হস্তগত হয় তবে ফেরত চলে আসবে। কাফেলা আরিশ পৌঁছলে, হযরত উমরের পত্র

হস্তগত হয়। তাতে সামনে অগ্রসর হবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, যেহেতু নির্দেশনা শর্তযুক্ত ছিল তাই হযরত আমর বলেন, এখন আমরা মিশরের সীমান্তে এসে গিয়েছি তাই তিনি আরিশ থেকে অগ্রসর হয়ে ফারামা পৌঁছান। (আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলি নুমানী, পৃ: ১৬০)

ইসলামী যুদ্ধ-সম্বলিত একটি গ্রন্থ রয়েছে, এর নাম হলো আল ইকতাফা। তাতে লিখা আছে, যখন হযরত আমর বিন আস রাফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি হযরত উমরের পত্র পান। কিন্তু তিনি এই আশঙ্কায় যে পত্রে ফিরে যাবার নির্দেশ থাকতে পারে যেমনটি হযরত উমর পূর্বেই বলেছিলেন- দূতের কাছ থেকে সেই পত্র গ্রহণ করেন নি আর যাত্রা অব্যহত রাখেন, এমনকি রাফা ও আরিশের মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলেন এবং এ স্থানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। বলা হল, এটি মিশরের সীমানার অন্তর্গত এলাকা। এরপর তিনি পত্র আনিয়ে তা পাঠ করলেন। তাতে লিখা ছিল, পত্র পাওয়া মাত্রই আপনি মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসুন। এতে তিনি তার সঙ্গীদের বললেন, আপনারা কী জানেন না এটি মিশরের অন্তর্ভুক্ত এলাকা? তারা বলল: হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি বললেন, আমিরুল মু'মিনীনের নির্দেশ হলো, যদি তার পত্র মিশরীয় সীমান্ত শুরুর পূর্বেই আমি পাই, তবে যেন ফেরত চলে যাই। কিন্তু এই পত্র আমি মিশরে প্রবেশের পর পেয়েছি তাই এখন আল্লাহ্‌র নামে এগিয়ে চল। অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও বলা হয় যে, হযরত আমর বিন আস ফিলিস্তিনে ছিলেন। আর তিনি অনুমতি ছাড়াই তার সঙ্গীদের নিয়ে মিশরে চলে গিয়েছিলেন। এ বিষয়টি হযরত উমর পছন্দ করেন নি। হযরত উমর তাকে পত্র লিখেন। হযরত উমরের পত্র হযরত আমর সেই সময় পান যখন তিনি আরিশের নিকটবর্তী ছিলেন। কিন্তু আরিশ পৌঁছার আগে পর্যন্ত তিনি সেই পত্র পাঠ করেন নি। আরিশ পৌঁছে পত্র পাঠ করেন। তাতে লিখা ছিল, উমর বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে আমর বিন আসের নামে। আম্মা বাদ, তুমি তোমার সাথীদের সাথে মিশরে গিয়েছ আর সেখানে রোমানদের এক বিশাল বাহিনী আছে। আর তোমার সাথে খুব কম সংখ্যক সৈন্যবাহিনী আছে। আমার জীবনের কসম, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। খুব ভালো হত, যদি তুমি তাদেরকে তোমার সাথে না নিয়ে যেতে। তুমি যদি মিশরে না পৌঁছে থাক তবে ফিরে আস।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনা মিন মাগাযি রসুলিল্লাহি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪-৩২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৪২০)

এ সফরে ফারামার পূর্বে মুসলিম সেনাবাহিনী কোথাও রোমান বাহিনীর মুখোমুখি হয় নি। মিশরীয়রা বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছে। সর্বপ্রথম ফারামাতে দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই বর্ণনাই সঠিক বলে মনে হয় যে, আরিশ অর্থাৎ মিশরের সীমান্তে পৌঁছার পর তিনি পত্র পেয়ে থাকবেন। এটি হতে পারে না যে, অজুহাত দাঁড় করানোর জন্য মিশরের সীমান্তে প্রবেশের অপেক্ষায় ছিলেন। যাহোক যখন তারা মিশর পৌঁছল তখন সামনেই অগ্রসর হতেই হত, কেননা মু'মিন পিছপা হয় না। রোমানরা এ সংবাদ পেয়ে যে, হযরত আমরের সাথে আগত সৈন্য সংখ্যা নিতান্তই কম এবং তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি খুবই দুর্বল, তাই তারা দীর্ঘদিন অবরোধ টিকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি আর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি তাই তাদের পিছু হটাতে বা পরাস্ত করতে সক্ষম হবো। এ ভেবে রোমানরা দুর্গবন্দী হয়ে যায়। অন্যদিকে হযরত আমর বিন আস রোমান সেনাবাহিনীর শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে জানতে পারেন যে, তারা অস্ত্র ও সৈন্যরা সংখ্যায় মুসলমানদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী। তাই তিনি ফারামার দখল করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যে, অতর্কিতে আক্রমণ করে দুর্গের ফটক খুলে দিতে হবে অথবা সে সময় পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে অবরোধ অব্যহত রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শহরবাসীর খাবার সামগ্রী ফুরিয়ে যায় আর তারা ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে না আসে। সুতরাং তিনি অবরোধ করেন। এদিকে মুসলমানদের অবরোধ ক্রমশ কঠোর হচ্ছিল আর অন্যদিকে রোমানরাও নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিল। এভাবে অবরোধ কয়েক মাস চলতে থাকে। কখনো কতক রোমান সৈন্য বাইরে আসলে খণ্ড লড়াই করে পেছনে সরে যেতো। এই খণ্ড যুদ্ধগুলোতে মুসলমানরাই জয়ী হত। একদিন রোমান সেনাবাহিনীর একটি দল গ্রাম থেকে বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে আসে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুসলমানরা জয় লাভ করে এবং রোমানরা পরাজিত হয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং দৌড়ে দ্রুততার সাক্ষর রাখে এবং রোমানদের দরজায় পৌঁছার পূর্বেই কিছু মুসলমান ফটকে পৌঁছে যায়। সেখানে পৌঁছে দুর্গের ফটক খুলে দেয় এবং সুস্পষ্ট বিজয়ের পথ উন্মোচন করে।

(সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আসসালাবি, (উর্দু), পৃ: ৭৫৫-৭৫৬, আল ফুরকান ট্রাস্ট)

বিলবিসের বিজয় কিভাবে হয়েছিল? ফারামার পর হযরত আমর বিন আস বিলবিস অভিমুখে যাত্রা করলে রোমান সেনাবাহিনী তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিলবিস ফুসতাত থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে সিরিয়ার পথে অবস্থিত একটি শহর। রোমানরা পথ অবরোধ করে যেন মুসলমানরা বেবিলনের দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে। প্রাচীন অভিধানে বেবিলন নামটি মিশরের এলাকার জন্য ব্যবহৃত হত। বিশেষভাবে যেখানে ফুসতাত জনবসতি গড়ে উঠেছিল এটিকে পূর্বে বেবিলন বলা হত। রোমান সেনাবাহিনী এখানেই লড়াই করতে চাইত, কিন্তু হযরত আমর বিন আস তাদেরকে বলেন, তোমরা তাড়াহুড়া করে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ আমরা আমাদের কথা তোমাদের কাছে উপস্থাপন না করি যেন ভবিষ্যতে আক্ষেপ করতে না হয়। এরপর বলেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আমার কাছে আবু মরিয়ম এবং আবু মারিয়ামকে দূত হিসাবে প্রেরণ কর। সুতরাং তারা লড়াই করা থেকে বিরত হয় এবং দূতদ্বয়কে প্রেরণ করে। এই উভয় দূত বিলবিসের খ্রিষ্টান যাজক ছিল। হযরত আমর তাদের সামনে হয় ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া কর প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং একইসাথে মিশরীয়দের সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর এই উক্তিও শুনালেন যে, তুমি মিশর জয় করবে। সেটি এমন এক শহর যেখানে কিরাতের প্রচলন রয়েছে। সুতরাং যখন তুমি সে দেশ জয় করবে সে দেশের অধিবাসীদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করবে কেননা তাদের প্রতি দায়িত্ব ও আত্মীয়তা রয়েছে। অথবা তিনি (সা.) বলেন, দায়িত্বশীলতা এবং শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়তা রয়েছে। উভয় দূত এ কথা শুনে বলল, এটি অনেক দূরের সম্পর্ক। তাকে নবীগণই পূর্ণ করতে পারেন। আমাদেরকে যেতে দাও, আমরা ফিরে এসে বলছি। হযরত আমর বিন আস বলেন, আমার মত ব্যক্তিকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি তোমাদেরকে তিন দিনের সুযোগ দিচ্ছি। তোমরা ভালভাবে বিষয়টি ভেবে দেখ। উভয় দূত বলল, আরো একদিনের অতিরিক্ত সময় দিন। তিনি তাদেরকে আরো একদিনের সময় দিলেন। উভয় দূত ফিরে এসে কিবতী সর্দার মুকাওকিস এবং রোমান কর্মকর্তার মিশরের শাসক আরতাবুনের কাছে আসে এবং মুসলমানদের প্রস্তাব তাদের সামনে উপস্থাপন করে। আরতাবুন মানতে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাতারাতি মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে। আরতাবুনের সৈন্যসংখ্যা ১২ হাজার বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যক সেনা এই যুদ্ধে শহীদ হন এবং রোমানদের এক হাজার সেনা নিহত হয় এবং তিন হাজার সেনা বন্দী হয় এবং আরতাবুন রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করে আর কেউ কেউ বলে যে, সে এই যুদ্ধেই মারা গেছে। মুসলমানরা তাকে তার সেনাবাহিনীসহ আলেকজান্দ্রীয়া পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, মুসলমানরা বিলবিসে এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। সেই সময় যুদ্ধ অব্যহত থাকে এবং পরিশেষে মুসলমানরা বিজয়ী হয়, এই যুদ্ধটি ভয়াবহ না কি সামান্য সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আসসালাবি, পৃ: ৭৫৭-৭৫৮) (আল ইকতিফা বিম তাযমিনা মিন মাগাযি রসুলিল্লাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৭)

এই যুদ্ধ চলাকালে একটি এমন ঘটনা ঘটে যা মুসলমানদের বিচক্ষণতা এবং উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে। ঘটনা হল, বিলবিসে আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন তখন এতে মুকাওকিসের কন্যা বন্দী হয় যার নাম আরমানুসা ছিল। সে তার পিতার প্রিয়তমা কন্যা ছিল। তার পিতা হিরাক্লিয়াসের পুত্র কনস্টান্টাইনের সাথে তার বিয়ে দিতে চাইত। কিন্তু সে এই বিয়েতে সম্মত ছিল না, তাই সে তার সেবিকার সাথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিলবিস এসেছিল। যাহোক, মুসলমানরা তাকে গ্রেফতার করলে হযরত আমর বিন আস (রা.) সকল সম্মানিত সাহাবীদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন এবং সেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লার এ বাণী পড়ে শোনান, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ অর্থাৎ, অনুগ্রহের প্রতিদান কি অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছু হতে পারে? (সূরা রহমান, আয়াত: ৬১) পুনরায় এ আয়াত هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, মুকাওকিস আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সমীপে উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে ছিলেন। আমার মতে এই মেয়ে এবং তার সাথে যেসব মহিলা ও তার সেবিকারা রয়েছে আর যেসমস্ত ধনসম্পত্তি আমরা পেয়েছি সেই সবকিছু মুকাওকিসের কাছে পাঠিয়ে দিব। সবাই আমর বিন আস (রা .)-এর মতামত সঠিক আখ্যা দেয়। এরপর হযরত আমর বিন আস (রা.) মুকাওকিসের কন্যা আরমানুসাকে তার সকল অলঙ্কারাদি, অন্যান্য মহিলা এবং সকল সেবিকাসহ অত্যন্ত সম্মানের সাথে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ফেরার সময় আরমানুসার দাসী তাকে বলে, আমরা সব দিক থেকে আরবদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে আরমানুসা বলে,

আরব তাবুতে আমি আমার জীবন ও সম্মানকে সুরক্ষিত মনে করি কিন্তু আমার পিতার দুর্গে নিজ জীবনকে সুরক্ষিত মনে করি না। এরপর সে তার পিতার নিকট পৌঁছলে তার সাথে মুসলমানদের আচরণ দেখে সে (তার পিতা) খুব আনন্দিত হয়। (সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা–আসসালাবি, পৃ: ৭৫৮–৭৫৯)

এরপর উম্‌দুনায়েন' এর বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে। বিলবিসের বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আস (রা.) মরুভূমির সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে উম্‌দুনায়েন জনপদের নিকট গিয়ে পৌঁছেন যা নীল নদের তীরে তিরাজান উপসাগরের উৎপত্তিস্থলের কাছে অবস্থিত। এ উপসাগরটি সুয়েজ খালের নিকট মিশর শহরকে ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত করত। বর্তমানে যেখানে কায়রোর মহল্লা আযবুকিয়া সেখানেই সে যুগে উম্‌দুনায়েনের জনপদ ছিল আর যেটিকে রোমানরা দুর্গাবদ্ধ করে রেখেছিল। এর নিকটে নীল নদের ঘাট ছিল আর সেই ঘাটে অনেক নৌকা নোঙ্গার করা থাকত। এই জনপদ ব্যাবিলনের উত্তরে ছিল যা মিশর শহরের সবচেয়ে বড় দুর্গ ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উম্‌দুনায়েনকে যা মিশরীয়দের সেসব প্রিয় অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল যেগুলো অতীতে ফেরাউনের রাজধানীও ছিল, সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা চৌকি বলা যেতে পারে। উম্‌দুনায়েনের কাছে গিয়ে মুসলমানেরা শিবির স্থাপন করে। রোমানরা ব্যাবিলনের দুর্গে তাদের সর্বোত্তম সৈন্যদের পৌঁছে দিয়েছিল আর উম্‌দুনায়েন দুর্গকে খুব ভালোভাবে সুদৃঢ় করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দা খবরের ভিত্তিতে হযরত আমর বিন আস (রা.) বুঝতে পেরেছেন যে, তার বাহিনী ব্যাবিলনের দুর্গ বিজয় বা অবরোধের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি (রা .) একজন দূতের হাতে একটি পত্র মদিনায় প্রেরণ করেন আর তাতে তার মিশর সফরের বিবরণ, দুর্গের বিস্তারিত বিবরণ এবং তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য সহায়ক–সৈন্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এদিকে সেনাবাহিনীর মাঝে ঘোষণা করিয়ে দেন, খুব শীঘ্রই সহায়ক–সৈন্য পৌঁছে যাবে। এরপর উম্‌দুনায়েন অভিমুখে অগ্রসর হন এবং একে অবরোধ করে দুর্গের ভিতরে খাদ্যসামগ্রী ও সামরিক সাজসরঞ্জাম যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেন। ব্যাবিলনের দুর্গে যেসব রোমান অবস্থান করছিল তারা এদিকে আসার চেষ্টা করে নি। কেননা তারা বিলবিসে আর্‌তাবুনের পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছিল আর তারা জানত যে, আরবদের সাথে খোলা মাঠে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও উম্‌দুনায়েনের সৈন্যরা কখনো কখনো বের হত এবং ব্যর্থ আক্রমণের পর ফিরে যেত। এভাবে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। ইত্যবসরে খিলাফতের দরবার থেকে সংবাদ আসে, প্রথম সহায়ক সেনাদল প্রেরণ করা হয়েছে আর তারা আজ কালের মধ্যে পৌঁছে যাবে। এ সংবাদ পাওয়ার পর মুসলমানদের শক্তি ও সাহস আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

(হযরত উমর ফারুক আযাম, প্রণেতা–মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৫৬৭–৫৭০, ইসলামি কুতুব খানা, লাহোর)

হযরত উমর (রা.) মুসলমান সেনাবাহিনীকে সাহায্যের জন্য ৪০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) প্রতি এক হাজার সৈন্যের জন্য একজন আমীর নিযুক্ত করেন। এসব আমীর ছিলেন, হযরত জুবায়ের বিনুল আওয়াম, হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ, হযরত উবাদা বিন সামেত এবং হযরত মাসলেমা বিন মাখাল্লেদ (রা.)। এক ভাষ্য অনুসারে হযরত মাসলামা বিন মুখাল্লেদ (রা.)–এর স্থলে খারযা বিন হুযাফা আমীর ছিলেন। হযরত উমর (রা.) এই সহায়ক–সৈন্যদল প্রেরণের পাশাপাশি হযরত আমর বিন আস (রা.)–কে পত্র লিখেন, এখন তোমার সাথে ১২,০০০ মুসলিম যোদ্ধা রয়েছে। সংখ্যা–স্বল্পতার কারণে এ সংখ্যা কখনো পরাজিত হবে না। রোমান যোদ্ধারা কিবতী সৈন্যদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়। উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। হযরত আমর বিন আস (রা.) সমরকৌশল হিসেবে নিজ সেনাদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। একাংশকে জাবালে আহমারের নিকট একটি স্থানে নিযুক্ত করেন, দ্বিতীয় অংশকে উম্‌দুনায়েনের নিকট নীল নদের তীরে একটি স্থানে মোতায়েন করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য বের হন। উভয় সেনাদলের মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধ হচ্ছিল তখন জাবালে আহমার–এ লুকিয়ে থাকা সৈন্যবাহিনী বের হয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করে, যার ফলে শত্রুদলের সামরিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে আর তারা উম্‌দুনায়েনের দিকে পলায়ন করে। সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় অংশ প্রস্তুত ছিল, তারা তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এভাবে রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের তিন সৈন্যদলের মাঝখানে আটক হয়ে যায় এবং শত্রুরা পরাজিত হয়।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা–আসসালাবি, পৃ: ৭৫৯)

বিবিধ বিজয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, উম্‌দুনায়েন বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আস (রা.) সর্বপ্রথম 'ফাইউম' এলাকায় জয় লাভ করেন আর এ অঞ্চলের নেতা এই যুদ্ধে নিহত হয়।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা– মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৫৭১–৫৭২, ইসলামি কুতুব খানা, উর্দু বাজার লাহোর)

এরপর 'আইনুশ্ শামস'– এ রোমানদের সাথে মুসলমানদের লড়াই হয়। এর পূর্বে ৮,০০০ সৈন্য সম্বলিত এক সাহায্যকারী সৈন্যদল হযরত আমর বিন আস (রা.)–এর সাথে গিয়ে যুক্ত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) আর এতে হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত, হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ ও মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রা.) প্রমুখও ছিলেন। এ যুদ্ধেও মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। এরপর মুসলমানরা সমগ্র 'ফাইউম' প্রদেশে বিজয় লাভ করে। মুসলমান সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ 'মনুফিয়া' প্রদেশের দু ই শহর 'ইসরীব' ও 'মানুফ' বিজয় লাভ করে।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা– মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৫৭৩, ৫৭৯, ইসলামি কুতুব খানা, উর্দু বাজার লাহোর) (এ্যাটলাস, ফুতুহাতে ইসলামিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৯)

ব্যাবিলন দুর্গের যুদ্ধ বা 'ফুসতাত' বিজয় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আমর বিন আস (রা.) উম্‌দুনায়েন বিজয়ের পর ব্যাবিলন দুর্গের দিকে অগ্রসর হন এবং কঠোর অবরোধ করেন। এই অঞ্চলের নাম ফুসতাত। এমন নামকরণের কারণ হলো আরবী ভাষায় তাবু –কে ফুসতাত বলা হয়। দুর্গ জয়ের পর হযরত আমর বিন আস (রা.) যখন এখান থেকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন তখন কাকতালীয়ভাবে হযরত আমর (রা.) –এর তাবুতে একটি পায়রা এসে বাসা বাঁধে। এটি দেখার পর তিনি (রা.) নির্দেশ দেন, এই তাবুটি এখানেই থাকতে দাও। পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ফিরে আসার পর হযরত আমর (রা.) এই তাবুর নিকটেই শহর গড়ে তুলেন। এজন্য এই শহর ফুসতাত নামে পরিচিতি লাভ করে।

(আল ফারুক, প্রণেতা–শিবলি নুমানি, পৃ: ১৫০–১৫১)

দুর্গে আনুমানিক ৫–৬ হাজার প্রতিরক্ষা সৈন্য ছিল আর তারা সব দিক থেকে সশস্ত্র ছিল। হযরত আমর (রা.) ব্যাবিলনের দুর্গ অবরোধ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার পর এটি ছিল খুবই মজবুত এবং পাকা ইট দিয়ে নির্মিত একটি দুর্গ আর চতুর্দিক থেকে নীল নদের পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এটি যেহেতু নীল নদের তীরেই অবস্থিত ছিল আর জাহাজ ও নৌকা দুর্গের ফটকে এসে ভিড়ত, তাই সরকারী প্রয়োজনীয়তা পূরণের নিরিখে খুবই উপযুক্ত একটি স্থান ছিল। আরবরা মজবুত এই দুর্গে আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল না আর না তারা এর জন্য প্রস্তুতও।

(সীরাত উমর ফারুক, প্রণেতা–মহম্মদ রেজা, পৃ: ২৬৪–২৬৫)

হযরত আমর (রা.) প্রথমে এটি অবরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মিশরের শাসক মুকাওকিস হযরত আমর বিন আস (রা.)–এর আগমনের পূর্বেই দুর্গে পৌঁছে গিয়েছিল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। হযরত যুবায়ের (রা.) ঘোড়ায় চড়ে পরিখার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন ছিল– উপযুক্ত সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মোতায়েন করেন। জয় –পরাজয় কোন প্রকার ফলাফল ছাড়াই দুর্গটি টানা সাত মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল।

(আল ফারুক, প্রণেতা– শিবলি নুমানি, পৃ: ১৫০)

সেই সময়ের ভেতর রোমান সৈন্যরা কখনো কখনো দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধ করতো, কিন্তু আবার ফিরে যেত। ঐ দিনগুলোতে মুকাওকিস কখনো কখনো সমঝোতার উদ্দেশ্যে, আবার কখনো হুমকি দেয়ার জন্য হযরত আমর বিন আস (রা.)–এর নিকট দূতদের প্রেরণ করতো।হযরত আমর বিন আস (রা.) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)–কে প্রেরণ করেন এবং সমঝোতা করার জন্য কেবল তিনটি শর্ত আরোপ করে দেন– হয় ইসলাম গ্রহণ কর কিংবা জিযিয়া প্রদান কর নতুবা যুদ্ধ হবে। তিনি (রা.) বলে দেন, এগুলো ছাড়া অন্য কোন শর্তে সন্ধি হবে না। মুকাওকিস জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয় এবং এ বিষয়ে হিরাক্লিয়াসের কাছে অনুমতি চাইতে নিজেই হিরাক্লিয়াসের কাছে যায়। কিন্তু হিরাক্লিয়াস তা প্রত্যাখ্যান করে, বরং মুকাওকিসের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে শাস্তিস্বরূপ দেশান্তরিত করিয়ে দেয়।

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

(সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, শখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৭৬০) (সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৫৯০,৫৮৪,৫৮২, ইসলামি কুতুব খানা, উর্দু বাজার লাহোর)

ব্যাবিলন দুর্গ জয় যখন বিলম্বিত হয় তখন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বলেন, এখন আমি আমার প্রাণ আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমেই মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। একথা বলেই তিনি নগ্ন তরবারি হাতে নেন এবং মই লাগিয়ে দুর্গের প্রাচীরের ওপর আরোহন করেন। গুটিকতক অন্য সাহাবীও তার সাথে যান। প্রাচীরের ওপর উঠে সমস্বরে সবাই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করেন আর একইসাথে পুরো মুসলিম বাহিনীও তকবির ধ্বনি উচ্চকিত করে, যার ফলে দুর্গের মাটি কেঁপে ওঠে। খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারে, মুসলমানরা দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়েছে। তখন তারা দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে আর হযরত যুবায়ের (রা.) প্রাচীর থেকে নেমে দুর্গের ফটক খুলে দেন এবং পুরো বাহিনী ভেতরে ঢুকে পড়ে আর লড়াই করতে করতে দুর্গ জয় করে নেয়।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, শখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৭৬০) (আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানি, পৃ: ১৫০, দারুল ইশাআত, করাচি, ২০০৪)

হযরত আমর বিন আস (রা.) তাদেরকে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করেন যে, রোমান সেনা নিজেদের সাথে কয়েক দিনের রসদ নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে এবং ব্যাবিলন দুর্গে যে ধনসম্পদ ও সমরাস্ত্র রয়েছে তাতে হাত দেবে না, কেননা এগুলো মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। এরপর হযরত আমর বিন আস (রা.) ব্যাবিলন দুর্গের গম্বুজ এবং উঁচু ও দৃঢ় প্রাচীরগুলো গুঁড়িয়ে দেন।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, শখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৭৬০)

ব্যাবিলন দুর্গ জয়ের পর মুসলিম বাহিনী মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল ও দুর্গ জয় করে, যার মধ্যে তারনুত, নাকিউস, সুলতায়েস, কিরিয়োন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৬০২,৬০৩,৬০৫,৬০৮)

আলেকজান্দ্রিয়া কীভাবে বিজিত হয় সে সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ফুসতাত জয়ের পর হযরত উমর (রা.) আলেকজান্দ্রিয়া জয় করারও অনুমতি প্রদান করেন। আলেকজান্দ্রিয়া ও ফুসতাতের মধ্যবর্তী স্থান কিরিয়োন-এ রোমানদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় যাতে মুসলমানরা জয়লাভ করেন। এরপর আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত রোমান সেনারা আর মুখোমুখি হয় নি। মুকাওকিস জিযিয়া দিয়ে সন্ধি করতে চেয়েছিল; কিন্তু রোমানরা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে মুকাওকিস হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠায় যে, সে এবং কিবতী জাতি এই যুদ্ধের অংশ নয়, তাই আমাদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। কিবতীরা এই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, বরং তারা মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করে এবং মুসলমানদের জন্য পথ সুগম করতে থাকে আর পুল মেরামত করে দেয়। আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের সময়ও কিবতীরা মুসলমানদেরকে রসদ সরবরাহ করতে থাকে। আলেকজান্দ্রিয়ার গুরুত্ব এবিষয় থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, মুসলমানরা যখন আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে তখন এই শহরটি (রোমানদের) রাজধানী হিসেবে গণ্য হত। কনস্টান্টিনোপোলের পর এটি রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বলে পরিগণিত হতো। উপরন্তু এটি পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক শহর ছিল। বাইযেনটাইন তথা রোমানরা একথা খুব ভালোভাবে জানত যে, এই শহরে যদি মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়ে যায় তাহলে এর ফলাফল হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। এমনই উদ্বেগজনক অবস্থায় হিরাক্লিয়াস এতদূর বলে বসে যে, আরবরা যদি আলেকজান্দ্রিয়ায় জয়ী হয়ে যায় তবে রোমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে! হিরাক্লিয়াস স্বয়ং আলেকজান্দ্রিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, কিন্তু এই প্রস্তুতির মাঝেই সে মারা যায় এবং তার পুত্র কনস্টান্টিন সম্রাট হয়। আলেকজান্দ্রিয়া এর প্রাচীরের দৃঢ়তা ও পুরুত্ব, অবস্থান ও রক্ষীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এক অনন্য মর্যাদা রাখত। আলেকজান্দ্রিয়ার অবরোধ নয় মাসব্যাপী চলতে থাকে। হযরত উমর (রা.) উদ্বিগ্ন হন এবং চিঠি লিখে বলেন, তোমরা সম্ভবত সেখানে থেকে আরামপ্রিয় হয়ে গিয়েছ, অন্যথায় বিজয় অর্জনে এতটা বিলম্ব হতো না! এই বার্তা দিয়ে মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত কর এবং আক্রমণ কর। হযরত উমর (রা.)-এর এই পত্র পড়ে শোনানোর পর হযরত আমর বিন আস (রা.) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-কে ডেকে এনে তার হাতে পতাকা তুলে দেন। মুসলমানরা প্রচণ্ড আক্রমণ করে এবং শহর জয় করে নেয়। তখনই হযরত আমর মদিনায় দূত প্রেরণ করেন এবং তাকে বলেন, যত দ্রুত যেতে পার যাও আর আমীরুল মু'মিনীনকে সুসংবাদ শোনাও। দূত উঁটে চড়ে একের পর এক গন্তব্য মাইলফলক অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছে। যেহেতু দুপুরবেলা ছিল, তাই এটি বিশ্রামের সময় ভেবে খলীফার দরবারে যাওয়ার পূর্বে সে সোজা মসজিদে নববীর দিকে যায়। ঘটনাক্রমে হযরত উমরের সেবিকা সেখানে আসে এবং জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছ? দূত বলে, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসেছি। সেই সেবিকা তখনই গিয়ে সংবাদ দেয় এবং একইসাথে ফিরে এসে বলে, চল! আমীরুল মু'মিনীন তোমাকে ডেকেছেন। হযরত উমর অপেক্ষা না করে নিজে আসতে উদ্যত হন আর চাদর ঠিক করছিলেন, এমন সময় দূত পৌঁছে যায়। বিজয়ের অবস্থা শুনে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করেন। এরপর তিনি উঠে মসজিদে আসেন এবং এই ঘোষণা করান যে, 'আস্‌সালাতুল জামেয়া'। এই ঘোষণা শুনতেই পুরো মদিনা দৌঁড়ে আসে। দূত সবার সামনে বিজয়গাঁথা বর্ণনা করে। এরপর দূত হযরত উমরের সাথে তাঁর ঘরে যায়। তার সামনে খাবার পরিবেশন করা হয়। এরপর হযরত উমর দূতকে জিজ্ঞেস করেন যে, সোজা আমার কাছে কেন আস নি? সে বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি বলেন, তুমি আমার ব্যাপারে এমনটি কেন ভাবলে? আমি যদি দিনের বেলা ঘুমাই তাহলে খিলাফতের বোঝা কে বইবে?

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের মাধ্যমে পুরো মিশর বিজয় হয়ে যায়। এসব যুদ্ধে বহুল পরিমাণে যুদ্ধবন্দী করা হয়। হযরত উমর সকল যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে হযরত আমরকে পত্রযোগে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সবাইকে ডেকে বলে দাও, তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা চাইলে মুসলমান হতে পারে অথবা নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। ইসলাম গ্রহণ করলে তারা সেই সমস্ত অধিকার লাভ করবে যা মুসলমানদের রয়েছে নতুবা জিযিয়া কর দিতে হবে, যা সকল জিম্মিপ্রজার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়। হযরত উমরের এই নির্দেশ যখন যুদ্ধবন্দীদের সম্মুখে পাঠ করা হয় তখন বহু যুদ্ধবন্দী ইসলাম গ্রহণ করে নেয় আর অনেকেই নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিত তখন মুসলমানরা 'আল্লাহু আকবর' নারা উচ্চকিত করত। আর যখন কোন ব্যক্তি খ্রিষ্ট ধর্মের ঘোষণা দিত তখন সকল খ্রিষ্টানের মাঝে শুভেচ্ছার গুঞ্জন শোনা যেত আর মুসলমানরা দুঃখিত হতো।

(আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ১৬২-১৬৫) সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আসসালাবি, (উর্দু), পৃ: ৭৬০-৭৬৪)

আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পোড়ানোর ঘটনাও কতিপয় প্রাচ্যবিশারদ বেশ আড়ম্বরের সাথে বর্ণনা করে থাকে। এর বাস্তবতা কী? আলেকজান্দ্রিয়ার এই বিজয়ের প্রেক্ষিতে বিরোধীরা, বিশেষত খ্রিষ্টান লেখকদের পক্ষ থেকে একটি আপত্তি করা হয় যে, হযরত উমর আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক বড় একটি লাইব্রেরীকে পোড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। আর এই আপত্তির মাধ্যমে এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যে, মুসলমানরা নাউযুবিল্লাহ্ কতটা বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার বিরোধী ছিল! অর্থাৎ তারা আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল লাইব্রেরীকে পুড়িয়ে দেয় যার আগুন ছয় মাস পর্যন্ত জ্বলতে থাকে! অথচ যুক্তি ও লেখনী উভয় দিক থেকে এই আপত্তি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও জাল বলে প্রতিভাত হয়, কেননা যে জাতিকে তার নেতা ও পথপ্রদর্শক রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই কথা বলেছেন যে, 'طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ'। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ইফতাহুল কিতাব ফিল ঈমান, হাদীস-২৮৮৬৯৭) আর যিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ'। অর্থাৎ, জ্ঞান অর্জন কর যদিও বা (এর জন্য) চীন পর্যন্ত যেতে হয়।

(কুনযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৮, কিতাব আল বাবুল আওয়াল)

আর যাদের জন্য পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং প্রণিধানের বিষয়ে বহু নির্দেশ ও আয়াত রয়েছে, এমন লোকদের ওপর লাইব্রেরী পোড়ানোর অভিযোগ আরোপ করা যুক্তি এবং প্রজ্ঞার নীতি বিরোধী। এছাড়াও বহু গবেষক, যাদের মাঝে স্বয়ং খ্রিষ্টান ও ইউরোপিয়ান গবেষকরাও রয়েছে, তারা এই বিষয়টি খণ্ডন করেছেন আর প্রমাণ করেছেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পোড়ানোর ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা গল্প। অতএব মিশরের একজন আলেম মুহাম্মদ রেযা তার পুস্তক 'সীরাত উমর ফারুক'-এ উক্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় আগুন দেওয়ার যে আপত্তি করা হয় তার উল্লেখ

আবুল ফারাজ্ মালাতী করেছেন। তিনি এই ঘটনা 'মুখতাসারুদ্ দুআল' নামক ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই ঐতিহাসিক ১২২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লিখেন যে, বিজয়ের সময় ইউহান্না আন নাহভী নামক এক কীবতি পাদ্রী ছিল, যে-কিনা মুসলমানদের মাঝে ইয়াহিয়া নামে খ্যাতি লাভ করে আর বিশ্বাসগত দিক থেকে সে খ্রিষ্টানদের ইয়াকুবিয়্যা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরবতীতে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর কাছে রাজভাণ্ডার থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু বই চাইলে হযরত আমর বিন আস (রা.) উত্তরে বলেন, হযরত উমর (রা.)'র কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পরই আমি তোমাকে কিছু বলতে পারব। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কাহিনী, কিন্তু তারপরও আমি আপত্তি খণ্ডনের জন্য তা উল্লেখ করছি। হযরত উমর (রা.) লিখেন, আপনি যেসব বইয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলোর বিষয়বস্তু যদি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কিতাবে যাকিছু আছে তা আমাদের জন্য যথেষ্ট আর এসব বইয়ের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর এগুলোর বিষয়াদি যদি আল্লাহ্র কিতাবের বিপরীত হয় তাহলেও এসব বইয়ের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব আপনি এরূপ পুস্তকাদি নষ্ট করিয়ে দিন। হযরত আমর বিন আস (রা.) আলেকজান্দ্রিয়ার হাম্মাম সন্নিবেশিত অগ্নিকুণ্ডে এসব বইয়ের বাছাই আরম্ভ করেন এবং সেগুলো ভাটায় জ্বালিয়ে দেন, এভাবে সেসব পুস্তক ছয় মাসে শেষ হয়ে যায়।

এই রেওয়ায়েতের উল্লেখ তাবারীর ইতিহাসেও নেই, ইবনে আসীরেও নেই, ইয়াকুবী ও কিন্দীতেও নেই, ইবনে আব্দুল হাকাম ও বালাজেরীতেও নেই এবং ইবনে খলদুন-ও এটি বর্ণনা করেন নি। কেবল আবুল ফারাজ ত্রয়োদশ খ্রিষ্ট শতাব্দীর মধ্যবতী সময়ে এবং সপ্তম হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন তথ্যসূত্র ছাড়াই এটি উল্লেখ করেছেন।

প্রফেসর বাটলার এই ইউহান্না নাহভী সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং লিখেছেন যে, সে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে, যাতে লাইব্রেরীতে আগুন দেওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে জীবিতই ছিল না। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' উল্লেখ করেছে যে, ইউহান্না পঞ্চম শতাব্দীর শেষে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিল। আর এটিও জানা কথা যে, মিশর বিজয় হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে। এদিক থেকে প্রফেসর বাটলার সঠিক বলেছেন যে, তখন সে প্রয়াত ছিল। অর্থাৎ যার বরাত টেনে কথা বলা হচ্ছে সে তো সেই অলীক ঘটনা, যার কথা বলা হচ্ছে তা ঘটার অনেক পূর্বেই মারা গিয়েছিল। এছাড়া ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান প্রফেসর ইসমাঈল-এর বরাতে তার পত্রিকা 'তারীখে আমর বিন আস'-এ লিখেছেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার তখন ছিলই না, কেননা এর দুটি অংশের মধ্য থেকে একটি বড় অংশ জুলিয়াস সিজারের সৈন্যরা উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং বিনা কারণে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭ সনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আর এর দ্বিতীয় অংশও একইভাবে উল্লিখিত যুগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এই ঘটনা তিউফিল পাদ্রীর নির্দেশে চতুর্থ শতাব্দীতে হয়েছিল।

প্রফেসর বাটলার লিখেন, আবুল ফারাজের কাহিনী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও হাস্যকর। বই যদি জ্বালাতেই হতো তবে তা সংক্ষিপ্ত সময়ে একবারেই জ্বালানো যেত। আর যদি তা ছয় মাসে জ্বালানো হয়ে থাকে তবে সেগুলোর মধ্য থেকে অনেক বই চুরিও হতে পারতো। আরবদের সম্পর্কে এটি জানা নেই যে, তারা কোন কিছু নষ্ট করেছে। গীবন লিখেছেন যে, ইসলামী শিক্ষা এই রেওয়ায়েতটির বিরোধিতা করে, কেননা ইসলামের শিক্ষা হলো, যুদ্ধলব্ধ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বইপুস্তক জ্বালানো বৈধ নয়। আর জ্ঞান, দর্শন, কাব্য এবং ধর্ম ছাড়া অন্যান্য জ্ঞানমূলক বইপুস্তকের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, ইসলাম সেগুলো থেকে লাভবান হওয়াকে বৈধ আখ্যা দিয়েছে। মুসলমানেরা বিজিত অঞ্চলগুলোতে গীর্জাসমূহ এবং তদসংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধনে বারণ করেছে, বরং বিধর্মী প্রজাদেরও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিল। তাহলে কি বিবেক এটি মেনে নিতে পারে যে, আমীরুল মু'মিনীন আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিবেন?

(সীরাত উমর ফারুক, প্রণেতা- মহম্মদ রেজা, পৃ: ২৯৪-২৯৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) স্বীয় পুস্তক 'তাসদীক্ব বারাহীনে আহমদীয়া'-তে এই আপত্তির উল্লেখ করে উত্তর দিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, জ্ঞানী ফেলুনাস হাকীম এর নিবেদনের প্রেক্ষিতে সেনাপতি আমর বিন আস আমীরুল মু'মিনীন খলীফা সানী উমর (রা.)-এর নিকট ঐ লাইব্রেরীর বিষয়ে নির্দেশনা চাইলে খলীফা লিখেন, তাৎক্ষণিকভাবে পুড়িয়ে ফেলা হোক। ছয় মাস পর্যন্ত সেসব অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে থাকে। তিনি (রা.) লিখেন, এই আপত্তি তো পাদ্রী সাহেবদের চাটুকারিতার ফলাফল, এতে কোন বাস্তবতা নেই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, শ্রোতাবর্গ! চিন্তা করে দেখুন, প্রথমতঃ যদি এটি ইসলামের রীতিনীতিতে থাকত তাহলে মুসলমানরা ও হযরত খলীফা উমর (রা.) তাঁর কল্যাণমণ্ডিত খিলাফতের প্রাথমিক অবস্থায় ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পবিত্র পুস্তকাবলী পুড়িয়ে ফেলত। কারণ এই দুই ধর্মই পবিত্র গ্রন্থের অনুসারী ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রথম সম্বোধিত ছিল। অতঃপর ইসলাম অগ্নিপূজারীদের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করে। কিন্তু কোন ইতিহাস এটি বলে না যে, ইসলাম তাদের বইপুস্তক পুড়িয়েছে। যদি এ কাজ ইসলাম অথবা ইসলামের খলীফাদের বৈশিষ্ট্য হতো, অর্থাৎ যদি এই রীতি থাকত তাহলেএই কাজের চিহ্নাবলী সর্বদা ইসলামে বিদ্যমান থাকার কথা, আর ইসলামের জন্য এর পথে কোন বাধা ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, দ্বিতীয়তঃ যদি ধর্মীয় পুস্তকাবলী পোড়ানো ইসলামী শাসক ও সাধারণ মুসলমানদের কাজ হতো তাহলে গ্রীক দর্শন, গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যা ও গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকাদির অনুবাদ আরবী ভাষায় অসম্ভব ছিল। তৃতীয়তঃ যদি মুসলমানরা বইপুস্তক পোড়ানোর রীতি অবলম্বন করত তাহলে বারাহীনে আহমদীয়া খণ্ডনকারী নিজের দেশের কোন দৃষ্টান্ত অবশ্যই উপস্থাপন করতো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বারাহীনে আহমদীয়ার খণ্ডন লেখকের উত্তরে এ কথাগুলো লিখছেন যে, তাকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বা আলেকজান্দ্রিয়ায় যেতে হতো না। তিনি (রা.) লিখেন, এখানে অর্থাৎ হিন্দুস্তানে কোন্ পুস্তক পোড়ানো হয়েছে? চতুর্থতঃ ইসলাম হিন্দুস্তানে সাতশ' বছরেরও অধিক সময় রাজত্ব করেছে। এই সময়ে ভগবত, রামায়ণ, গীতা, মহাভারত এবং এগুলোর অনুরূপ লিং পুরাণ, মারকুণ্ডি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পুস্তক রয়েছে; যা আজও ধর্মীয় ও পবিত্র পুস্তক হিসেবে বিশ্বাস করা হয়।এদের একটিও পোড়ানোর সংবাদ কানে আসে নি, বরং সেসব গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে অনেকগুলোর অনুবাদ হয়েছে। তাই অবাক হতে হয়, কেন এই হিন্দুরা ভাবল যে, মুসলমানরা তাদের গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দিয়েছে। ন্যায়সঙ্গতভাবে ভেবে দেখ!

(তসদীক বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৩-২০৪)

এই আপত্তির উত্তরে 'তাসদীক্ব বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে হযরত মওলানা আব্দুল করিম সাহেবও নোট লিখেছেন। তিনি লিখেন, যদিও তখন পর্যন্ত যখন এই ঘটনার কোন গবেষণা করা হয়নি আর প্রকৃত চিত্র সামনে আসেনি, যখন মুসলমানদের ওপর এ অপবাদ আরোপ করা হতো, কিন্তু এখন ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যপ্রিয় আলেমগণের মাঝে এমন লোক অনেক কম রয়েছে যারা এই মিথ্যা অপবাদ মুসলমানদের প্রতি আরোপ করে। এই অপবাদের কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছিল বিদ্বেষ ও অজ্ঞতা। কিন্তু এখনও এই আপত্তিকারীদের কাছে কোন সঠিক সনদ ছিল না, অর্থাৎ এই ঘটনার বর্ণনাকারী দুইজন ঐতিহাসিক উক্ত ঘটনার পাঁচশত আশি বছর পর জন্মগ্রহণ করেছে আর পূর্বের কোন সনদ তাদের কাছে ছিল না। সেন্ট ক্রয় যিনি আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর গবেষণায় অনেক পুস্তক লিখেছেন, এই রেওয়ায়েতকে পুরোপুরি মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। আর জানা যায় যে, এসব পুস্তিকাদি জুলিয়াস সিজারের যুদ্ধে পুড়ে গিয়েছিল।

যেমন প্লুটার্ক 'দি লাইফ অফ সিজার' পুস্তকে লিখেছেন যে, জুলিয়াস সিজার শত্রুদের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজ জাহাজসমূহে আগুন লাগিয়ে দেয় আর সেই আগুন বিস্তৃত হয়ে এমন স্থানে পৌঁছে যে তা আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীকে সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত করে ফেলে।

হেইডেন তার পুস্তক 'ডিক্শনারী অফ ডেটস রিলেটিং টু অল এজেস'-এ যেখানে এই মিথ্যা রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, সেখানে নিজ গবেষণার প্রেক্ষিতে এই নোট লিখেছেন যে, এই ঘটনা পুরোপুরি সন্দেহযুক্ত। হযরত উমরের বক্তব্য, "যদি সেই গ্রন্থসমূহ ইসলামবিরোধী হয়ে থাকে তাহলে (সেগুলো) জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত"। মুসলমানরা এ উক্তির সত্যতা স্বীকার করে নি। কেউ কেউ এই কথাকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ থিওফ্লিসের প্রতি আরোপ করেছে যিনি ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন আর কেউ কেউ এটিকে কার্ডিনাল জেমিনিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছে যিনি ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি আরও লেখেন, আমাদের প্রসিদ্ধ যুবক ডাক্তার লাইটনার তার পুস্তক সানিনুল ইসলামে এই ভ্রান্ত রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন। আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, উক্ত ডাক্তার সাহেব নিজের গবেষণায় ভুল করেছেন।

জন উইলিয়াম ডারপার তার প্রসিদ্ধ বইয়ে প্রথমত এই উক্তিকে ভুল রেওয়ায়েতকারীদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু পরবতীতে গিয়ে এর রেওয়ায়েতের ভ্রান্তি তিনি স্বীকার করেছেন এবং তিনি লিখেছেন, সত্যিকার অর্থে এসব বই জুলিয়াস সিজারের যুদ্ধে জ্বলে গেছে। এখন দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে বলা যেতে পারে যে, এই উক্তি নিঃসন্দেহে অলীক ও ভ্রান্ত কাহিনী। অশ্রু বিসর্জন দিতে হলে কেবল এই সত্য বিষয়ের জন্য দেওয়া যেতে পারে বা পরিতাপ করতে চাইলে এর জন্য করা যেতে

পারে যে, বিদ্বেষী কার্ডিনাল জেমিনেজ ৮০ হাজার আরবী হস্তলিখিত বই গ্রানাডার ময়দানে জ্বালিয়ে ভষ্মীভূত করেছে যখন স্পেন মুসলমানদের কাছ থেকে এরা ছিনিয়ে নেয় অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা দখল করে সেখানে গ্রানাডার লাইব্রেরীর ৮০ হাজার বই তারা পুড়িয়ে ভষ্মীভূত করেছে। ইসলামের ওপর অপবাদ আরোপ করার পরিবর্তে এস্থ লে অশ্রু বিসর্জন দেওয়া উচিত। কনফ্লিক্ট বিটুইন রিলিজিয়াস এন্ড সাইন্স-পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(তসদীক বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৩)

যাহোক, এগুলো পাঠাগার জ্বালানো সংক্রান্ত রেফারেন্স যে বিষয়ে ইসলামের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়।

এরপর আছে বারকা এবং ত্রিপলি বিজয়ের ঘটনা। মিশর বিজয়ের পর সেখানে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় আর আমর বিন আস পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন যেন বিজিত এলাকা থেকে কোন শঙ্কা অবশিষ্ট না থাকে। বারকা এবং তারাবলুসের দুর্গে কিছু রোমান বাহিনী ছিল। এ সুযোগে স্থানীয় লোকদের প্ররোচিত করে মিশরে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে পারত। আলেকজান্দ্রিয়া এবং মরক্কোর মধ্যবর্তী যে এলাকা, সেটিকে বলা হয় বারকা। এই অঞ্চলে বেশ কিছু শহর এবং জনপদ ছিল। আমর বিন আস ২২ হিজরীতে তার বাহিনী নিয়ে বারকার দিকে অগ্রসর হন। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বারকা পর্যন্ত পথ খুবই সবুজ-শ্যামল এবং ঘন জনবসতিপূর্ণ ছিল। তাই সেখানে পৌঁছানোর সময় তাঁকে শত্রুর কোন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে হয় নি। সেখানে যখন পৌঁছেন তখন মানুষ কর আদায়ের শর্তে শান্তিচুক্তি করে। এরপর বারকার লোকেরা মিশরের গভর্ণরের কাছে নিজেরাই গিয়ে নিজেদের আয়কর জমা করে আসত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাউকে তাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতে না। এরা পশ্চিমের সবচেয়ে সহজ-সরল মানুষ ছিল। তাদের এলাকায় কোন ফিতনা বা নৈরাজ্য ছিল না।

আমর বিনুল আস এখান থেকে বের হয়ে ত্রিপলির দিকে অগ্রসর হন যা নিরাপদ দুর্গ বিশিষ্ট শহর ছিল। সেখানে রোমান বাহিনীর একটি বিরাট সংখ্যা অবস্থান করছিল। তারা মুসলমানদের আগমানের সংবাদ শুনে নিজেদের দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলমানদের অবরোধ সহ্য করতে থাকে। এই অবরোধ এক মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মুসলমানরা খুব একটা সাফল্য লাভ করে নি। ত্রিপলি শহরের পেছনের অংশে শহর সন্নিবেশিত সমুদ্র প্রবহমান ছিল। সমুদ্র এবং শহরের মাঝে কোন প্রতিবন্ধক দেওয়াল ছিল না। মুসলমানদের একটি দল এই রহস্য সম্বন্ধে অবগত হয়। পেছন থেকে তথা সমুদ্রের দিক থেকে শহরে প্রবেশ করে উচ্চস্বরে নারা ধ্বনিত করে। তখন সেনাবাহিনীর নিজেদের নৌকায় বসে পালানো ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। তাই তারা পেছনে ছুঁটতেই পেছন থেকে আমর বিন আস তাদের ওপর আক্রমণ করেন। তাদের অধিকাংশের জীবন সাঙ্গ করা হয় কেবল তারা ব্যতীত যারা নৌকায় চড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। শহরের ধনসম্পদ মুসলমানরা মালে গণিমত হিসেবে হস্তগত করে।

ত্রিপলি বিজয়ের পর আমর বিনুল আস তার বাহিনীকে নিকটবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে দেন। তার ইচ্ছা ছিল, পশ্চিমে বিজয়ের কাজ সমাপ্ত করে তিউনিশিয়া এবং আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হবেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) -এর বরাবর তিনি পত্র লেখেন। অথচ হযরত উমর ইসলামী বাহিনীকে নতুন রণক্ষেত্রে প্রেরণের বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন আর বিশেষতঃ তিনি (রা.) যখন সিরিয়া থেকে ত্রিপলি পর্যন্ত দ্রুতগতিতে বিজয়াভিযানের কারণে বিজিত অঞ্চলগুলোর বিষয়ে তিনি শতভাগ আশ্বস্ত ছিলেন না; এজন্য তিনি (রা.) ইসলামী সেনাবাহিনীকে ত্রিপোলিতে অবস্থান করতে আদেশ দেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খেলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের গণ্ডি দূর-দূরান্তের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বে জিহুন এবং সিন্ধু নদ থেকে নিয়ে পশ্চিমে আফ্রিকার ধূসর মরুভূমি পর্যন্ত আর উত্তরে এশিয়া মাইনরের (অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত তৎকালীন সাইলেসিয়া প্রদেশ) পাহাড় ও আর্মেনিয়া থেকে নিয়ে দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং নুবিয়া পর্যন্ত একটি বিশ্বময় বিস্তৃত দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। নুবিয়া দক্ষিণ মিশরের একটি সুবিস্তৃত এলাকা যেখানে নানা জাতি-ধর্ম -বর্ণ ও সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের অভ্যুদয় ঘটে। কেবল মিশরীয় অঞ্চলেই নয় বরং মুসলিম শাসিত গোটা অঞ্চলে বৈচিত্রপূর্ণ নানা জাতি, ধর্ম ও সভ্যতার বসতি ছিল আর সবাই ইসলামের ন্যায় ও দয়ামায়ার সুশীতল ছায়াতলে পরম শান্তিতে বসবাস করে। সেই ইসলাম ধর্ম যা ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদতের রীতি-নীতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন লোকদের হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে এবং তাদের জীবনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিল।

(সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব শখসিয়াত কে কারনামে, প্রণেতা-আস সালাবী, পৃ: ৭৬৫-৭৬৬) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬২) (মুজামুল বালদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৭)

যুদ্ধ চলাকালে মুসলমানদের ইবাদতের মান কেমন ছিল সে প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, পৃথিবীর সবকিছু ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে। বড় বড় কাজও নিমিষেই হয় না বরং ধীরে ধীরে হয়। মহানবী (স া.)-এর যুগেও সব মুসলমান তাহাজ্জুদ পড়ত না। ধীরে ধীরে তাদের মাঝে তাহাজ্জুদের অভ্যাস সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এমনকি এক যুগ আসল যখন কিনা হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও মুসলমানগণ তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। অথচ এটি প্রমাণিত সত্য যে রসূল করীম (সা.)ও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কখনো কখনো তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন না। সম্ভবত রসূলে করীম (সা.) যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন কিন্তু এটি প্রমাণিত যে , তিনি কখনও কখনও এরূপ মুহূর্তে তাহাজ্জুদ নামাজে উঠতেন না। অথচ হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালীন সময়ে মুসলমানগণ যু দ্ধ চলাকালীন সময়েও তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করত। এমনকি একবার হিরাক্লিয়াস যখন মুসলমানদের ওপর রাতের আধারে আক্রমণ চালানোর জন্য মনস্থির করল তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর পরিশেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, এভাবে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। রাতের আধারে হাল্লা করা বৃথা কেননা তারা তো রাতে ঘুমায় না বরং তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ে রত থাকে। এটিও উন্নতির চিহ্ন যা প্রাথমিক যুগে ছিল না। প্রাথমিক যুগে রসূলে করীম (সা.)-কে এর জন্য অনেক অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে দুর্বল প্রকৃতির লোকেরাও ধীরে ধীরে এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ১৮৯)

খোলাফায়ে রাশেদীনদের যুগে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে মুসলেহ মওউদ(রা.) বলেন, ইসলাম কেবলমাত্র মোকাবিলা করার নির্দেশই প্রদান করে নি বরং কোন কোন যুক্তির অধীনে অন্যায়কে সহ্য করার শিক্ষা দিয়েছে।

অতএব যেখানে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে চড়ের বিপরীতে চড় মারার অনুমতি দেয়া আছে সেখানে ইসলাম এ-ও বলেছে যে, যদি তোমরা তা শান্তির পরিপন্থী বলে মনে কর তবে তোমরা নিরব থাক ও চড়ের বিপরীতে চড় মেরো না। তাই এসব যুদ্ধ সম্পর্কে সচরাচর যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে হযরত আবু বকর, উমর ও উসমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত শত্রুর অভিযোগের খণ্ডন হয়ে যায়। এটি জানা যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) কোন অন্যায়-অত্যাচার করেন নি বরং কায়সার অত্যাচার করেছে, হযরত উমর (রা.) অন্যায়-অত্যাচার করেন নি বরং ইরানের সম্রাট অত্যাচার করেছে। হযরত উসমান (রা.) অন্যায়-অত্যাচার করেন নি বরং আফগানিস্তান ও বুখারার সীমান্তবর্তী গোত্রগুলো, কুর্দি ও অন্যান্যরা করেছে। কিন্তু এ কথার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না যে, হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের ক্ষমা কেন করেন নি? যখন তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল তখন তারা রোমান সম্রাট কায়সারকে বলতে পারত যে, তোমার সেনাদের দ্বারা অমুক ভুল হয়ে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমার সরকার যদি আমাদের নিকট ক্ষমা চায় তবে আমরা ক্ষমা করে দিব আর ক্ষমা না চাইলে আমরা যুদ্ধ করব। তারা রোমান সম্রাট কায়সারের সমীপে এমন কথা বলেন নি যে, তুমি বা তোমার সেনাবাহিনীর একাংশের হাতে অমুক সময়ে এ অন্যায় সাধিত হয়েছে এবং যেহেতু আমাদের শিক্ষার মাঝে শত্রুদের ক্ষমা করার শিক্ষা বিদ্যমান, এ কারণে যদি তোমরা ক্ষমা চাও তবে আমরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি।

(শেষাংশ ১০ এর পাতায়...)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সিঙ্গাপুর সফর

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩

ইন্ডোনেশিয়ার ওয়াকফে নও-ক্লাসের প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, ইসলাম সমস্ত ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের বিশ্বাস, ইসলাম হল সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটি সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ ধর্ম। কুরআন করীম শেষ ধর্মগ্রন্থ এবং আঁ হযরত (সা.) শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন শরিয়তধারী নবী আসতে পারে না। কিন্তু শরিয়তবিহীন নবী আসতে পারে আর আঁ হযরত (সা.) এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন এমন এক যুগ আসবে যখন নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের অক্ষরসমূহ ছাড়া কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুস ভুলে যাবে। তাদের মসজিদসমূহ বাহ্যত নামাযীতে পরিপূর্ণ হবে, কিন্তু সেগুলি হবে হিদায়তশূন্য। এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ কে পাঠাবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন, ইসলাম স্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন। তোমরা তাকে গ্রহণ করো এবং তাকে আমার সালাম পোঁছে দিও। আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এসে গিয়েছিলেন, যিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহম কাদিয়ানী। ১৮৮৯ সালে তিনি জামাতের ভিত্তি রাখেন। আমরা তাঁকে শরিয়তবিহীন নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁকে মেনে নেয় নি, প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা তাকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে মেনেছি। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানেরা এখনও অপেক্ষা করছে। আমাদের দাবি, যার আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন। এখন আকাশ থেকে কেউ আসবে না। কুরআন করীম ঘোষণা করছে, প্রত্যেক ব্যক্তি মরণশীল। 'কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাউত'। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। হযরত ঈসা (আ.)ও মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমরা মসীহ মওউদ কে মেনে সোজা পথে রয়েছি, আমরা হিদয়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর ইলহাম হয়েছিল যে, 'ধরাপৃষ্ঠের সকল মুসলমানকে এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর একত্রিত করা হবে।' আর সেই অভিন্ন ধর্ম হল ইসলাম। আর আপনারা যারা ওয়াকফে নও, তাদের দায়িত্ব হল সেই বাণী সকলের কাছে পোঁছে দেওয়া। আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করা। জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত বাণী পোঁছে দিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতি বছর আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে ইসলামের নাম সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে।

একজন খাদিমের প্রশ্ন: পড়াশোনা শেষ করে নিজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে চাই। এতে হুযুর বলেন, এবিষয়ে কেন্দ্রকে লিখিতভাবে জানান। এরপর খলীফাতুল মসীহ সিদ্ধান্ত নিবেন যে অনুমতি দেওয়া হবে কি না।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমাদের এই পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের স্পন্দন আছে। এমতাবস্থা রসুলুল্লাহ্ (সা.) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য রহমতুল্লিল আলামিন কিভাবে হলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, অতীতের রসুলদের জন্য আলামীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ কিছু কিছু নবীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন- 'ওয়া কুল্লান ফাযযালনা আলাল আলামীন।' অর্থাৎ আমরা তাদের সকলকে সমগ্র জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন- 'আলামীন বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সব জগত যা সম্পর্কে মানুষ অবগত আছে। অর্থাৎ মানুষ যতদূর পর্যন্ত পোঁছতে পেরেছে, ততদূর পর্যন্ত তারা রহমতুল্লিল আলামীন। এছাড়া অন্যান্য জগত পর্যন্ত পোঁছনোর জন্য খোদা তা'লা কি পন্থা রেখেছেন তা তিনিই ভাল জানেন।

একজন খাদিমের প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার বলেছেন, আপনারা যদি হাত খরচ বাবদ কিছু টাকা পান তা থেকে ওসীয়ত করুন। আর যদি কিছু না পান এবং উপার্জনও না করেন, সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- তিন জন শহীদের ঘটনার পূর্বের কেউ জানত না। কিন্তু এখন সারা পৃথিবী জানে যে ইন্ডোনেশিয়ায় পাকিস্তানের মত চরমপন্থী রয়েছে। এখন অনেকগুলি এন.জি.ও ইন্ডোনেশিয়াকে সেই সব দেশের তালিকায় রেখেছে যেখানে মানবাধিকার লাঞ্ছিত হচ্ছে। ইন্ডোনেশিয়ার এই জঘন্য ভাবমূর্তি সেখানকার মোল্লাদের কারণে হয়েছে।

এখন পরিস্থিতি কিছু ভাল হয়েছে, তবুও মসজিদে আক্রমণ হচ্ছে। লোকেদের এক ইন্ডোনেশিয়ার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে যে সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না।

আপনারা ইন্ডোনেশিয়ার জন্য দোয়া করুন। আপনারা যদি নিজেদের দেশকে ভালবাসেন তবে এমন কাজ করবেন না যাতে বিশ্বে দেশের সুনামহানি হয়।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, আমরা কি রাজনীতিতে অংশ নিতে পারি? এর উত্তরে বলেন, একজন নাগরিক হিসেবে অংশ নিতে পারেন, কিন্তু ওয়াকফে নও হিসেবে প্রথমে জামাতের সেবা করুন। একজন আহমদী হিসেবে দেশের রাজনীতিতে নিজের অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু যারা ওয়াকফে নও তাদেরকে জামাতের সেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, স্বাধীনতা ও শান্তির মধ্যে কোনটি উত্তম? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে শান্তিও থাকবে। আর যেখানে শান্তি আছে সেখানে স্বাধীনতাও থাকবে।

১২ ই অক্টোবর, ২০১৩

সংবাদ প্রতিনিধিদেরকে সাক্ষাতকার

'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, দ্য স্টান্ডার্ড এবং ব্ল্যাকটাউন সান' এর প্রতিনিধিরা হুযুরের সাক্ষাতকার নেন।

প্রশ্ন: একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আহমদী এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ও মতবিরোধ কি ?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, এমন এক যুগ আসবে যখন নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের অক্ষরসমূহ ছাড়া কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুস ভুলে যাবে। তাদের মসজিদসমূহ বাহ্যত নামাযীতে পরিপূর্ণ হবে, কিন্তু সেগুলি হবে হিদায়তশূন্য। এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ কে পাঠাবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন, ইসলাম স্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আঁহযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মসীহ ও মাহদী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের দাবি, যে মসীহর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানেদের দাবি, তিনি এখনও আসেন নি। তারা হযরত হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগণে বিশ্বাসী, তারা তাঁরই প্রতীক্ষা করছে যে তিনি কখন আকাশ থেকে নামেন। আর তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর পর নবী হিসেবে আসবেন।

আমাদের দাবি, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আকাশ থেকে কেউই নেমে আসবে না। যার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আছে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর রূপে গুণান্বিত হয়ে আসবেন আর তিনি এসে গিয়েছেন।

আমাদের দাবি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) শরীয়তবিহীন নবী, তিনি কোন নতুন শরিয়ত নিয়ে আসেন নি। অতএব, আমরা খাতামান্নাবীঈন -এর বিরোধী নই এবং আঁ হযরত (সা.) নবুয়্যতের মোহর ভঙ্গ হয় না। অপরদিকে যে সমস্ত মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আ.)-এর অপেক্ষায় আছে, তারা আঁ হযরত (সা.)কে খাতামান্নাবীইন হিসেবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আ.) নবী হিসেবে আসবেন।

কাজেই আমাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে মূল মতানৈক্য এই যে, আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদকে শরীয়তবিহীন নবী বলে বিশ্বাস করি, অন্যদিকে অন্যদের দাবি, আঁ হযরত (সা.)-এর পর কেউ নবী হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দাবি, নতুন শরিয়তধারী নবী আসতে পারে না ঠিকই, কিন্তু শরিয়ত বিহীন নবী আসতে পারে। আর তা খাতামান্নাবীঈন এর পরিপন্থী নয়। (ক্রমশ....)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

প্রশ্ন: হযরত আমীরুল মু'মিনীনের (আই.) সমীপে এক ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মহিলাদের কুরআন স্পর্শ করা এবং কম্পিউটার, আইপ্যাড ইত্যাদির মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত করা বিষয়ে বিভিন্ন ফিকাহবিদদের উক্তি সম্বলিত তুলনামূলক গবেষণা পত্র পেশ করে হুযূরের সদয় নির্দেশনার অনুরোধ করেন।

হুযূর (আই.) তার ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর লেখা চিঠিতে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন: "এই বিষয়ে ফিকাহবিদ এবং ইসলামী দার্শনিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। শরীয়তের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গরা কুরআনের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।"

"পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী (সা.)-এর হাদিস এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রায় অনুসারে, এই বিষয়ে আমার মত এটাই যে, মাসিকের সময়ে একজন মহিলা তার মুখস্ত করা কুরআনের অংশ যিক্‌র হিসেবে মৌখিকভাবে পড়তে পারে। এছাড়া যদি গুরুতর প্রয়োজন হয় তাহলে সে পবিত্র ও পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কুরআন ধরতে পারে এবং কাউকে রেফারেন্স দেয়ার জন্য অথবা শিশুদের কুরআন শিখানোর স্বার্থে কুরআনের অংশ পড়তেও পারবে। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবে কুরআন পড়তে পারবেন না।"

"একইভাবে ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কম্পিউটার, ইত্যাদি দেখেও কুরআন পড়তে পারবে না, যদিও সে কুরআন শারীরিকভাবে স্পর্শ করবে না। কিন্তু জরুরী ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স খুঁজতে বা কাউকে কোনো রেফারেন্স দিতে সে কম্পিউটারে কুরআন পড়তে পারে। এক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই।"ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করামহিলাদের ঋতুস্রাবকালীন সময়ে আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়া বিষয়ে এক মহিলা বিভিন্ন হাদিস সম্বলিত একটি চিঠি হুযূরের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মহিলাদের মসজিদে মিটিং-এ যোগদান করা এবং ঋতুবতী অ-আহমদী মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শনের অনুমতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হুযূরের কাছে নির্দেশনার জন্য অনুরোধ করেন।

এই বিষয়ে হুযূর (আই.) তার ২০২০ সালের ১৪ মে-র চিঠিতে নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করেন: "হযরত রসূলে করীম সা.) মহিলাদের ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদে কিছু নিয়ে আসা এবং মসজিদে বসা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। যেহেতু আপনি আপনার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) তার স্ত্রীদের ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে মাদুর বিছাতে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে বসার বিষয়ে হাদিসে হুযুর (সা.) স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।"

"অতএব, হুযূর (সা.) দুই ঈদের নামাযে অবিবাহিত যুবতী মেয়েদের পর্দা করে ঈদের নামাযে যোগ দিতে এমনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি মেয়েরা ঋতুবতী হয় এবং তাদের কাছে যদি পর্দার ব্যবস্থা না-ও থাকে, তাহলে তারা যেন তাদের বোনদের কাছ থেকে স্কার্ফ ধার নিয়ে ঈদের নামাযে যায়। কিন্তু তিনি (সা.) ঋতুবতী মহিলাদের মূল নামায ঘরের বাহিরে থেকে নামাযের পর দোয়ায় যোগদানের অনুমতি দিয়েছেন।"

"একইভাবে বিদায় হজ্বের সময় যখন সকল মুসলমানরা হজ্বের আগে ওমরা সম্পন্ন করছিল তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঋতুকালীন সময় চলছিল। এই কারণে হুযূর (সা.) তাকে ওমরা করার অনুমতি দেন নি। কেননা ওমরার সময় কাবার তাওয়াফের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় মসজিদে থাকতে হয়। যখন হজ্বের পর তার মাসিক শেষ হয়ে যায়, তাকে ওমরার অনুমতি দেওয়া হয়।"

"তাই হাদিসে এরকম স্পষ্ট নির্দেশনা থাকায় আমাদের কাছে নতুন কোন পথ নেই যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি।""এই ব্যাপারে বাস্তবতা হল, অতীতে অনেক মহিলার কাছে বর্তমানের মতো আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সহজলভ্য ছিল না। এটি সঠিক যে, তাদের কাছে এই সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনের সামর্থ ছিল না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা একেবারেই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতো না এবং তাদের পোষাক নোংরা হয়ে যেত। মানুষ প্রত্যেক যুগেই তার প্রয়োজন পূরণে সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তাই মহিলারা অতীতেও এবং আজও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে।"

"অধিকন্তু অবশ্যই বর্তমান সুরক্ষা ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি রয়েছে। অনেক মহিলা এমন রয়েছেন যাদের রক্তপাত বেশি হয়। যার ফলে 'প্যাডে লিকিংস' এর কারণে কাপড় রক্তে নোংরা হয়ে যায়।" "এভাবেই প্রত্যেক যুগে ইসলামের শিক্ষা অনুসৃত হবে আর এই ধারাবাহিকতা চিরস্থায়ী এবং যেভাবে রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে অনুসৃত হয়েছে তেমনি সবযুগেই এই শিক্ষা সর্বজনবিদিত। যদিও কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধতা রয়েছে যে, নামাযের ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘর নেই। তাহলে এমন কোন জায়গা নির্বাচন করুন যেমন রুমের পিছন দিকে দরজার কাছে যেখানে সাধারণত কেউ নামায পড়ে না। ঋতুবতী মেয়েরা সেখানে বসতে পারেন। অন্যথায় নামাযের জায়গার পিছন দিকে এমন জায়গায় এদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে সাধারণত নামায পড়া হয় না।"

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

"আর অমুসলিম মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শন করার বিষয়ে মনে রাখতে হবে, প্রথমত তাদেরকে সাধারণত মসজিদে বসানো হয় না বরং তাদের হেটে হেটে মসজিদ পরিদর্শন করানো হয়। আর এই সময়টা ততটাই হয় যতটা মসজিদ থেকে মাদুর আনতে বা মাদুর বিছাতে লাগে। আর যদি তাদের নামাযের জায়গায় বসাতেই হয় তাহলে তাদের নামাযের মাদুরে না বসিয়ে বরং তাদের নামাযের জায়গার শেষে পিছনের দিকে চেয়ারে বসাবেন।"

উপরোক্ত জবাবে হুযূর (সা.)-এর ঋতুবতী মহিলাদের ঈদের নামাযের দোয়ায় যোগদানের স্পষ্ট নির্দেশনাও হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন। (ক্রমশ.....)

(খুতবার শেষাংশ....)

মুসলমানরা এমনটি বলে নি বরং যখন সে অন্যায় করে বসল তখন তৎক্ষণাৎ মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনী সেই যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। ইরানী সেনাবাহিনী যখন ইরাকের সীমান্তে হামলা করে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরপর সাহাবী এবং ইরানীদের মাঝে যুদ্ধ করা বৈধ হয়ে যায় তবে উন্নত নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত উমর ইরানের বাদশাহ্ কে এটিও বলতে পারতেন যে, তুমিহয়তো এই আক্রমণ করার আদেশ দাও নি, হয়তো সৈন্যদল নিজে থেকেই এই আক্রমণ রচনা করেছে; এ কারণে আমরা এই আক্রমণকে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি তবে শর্ত হলো, তুমি এই আক্রমণের জন্য ক্ষমা চাও এবং অনুশোচনা কর, কিন্তু হযরত উমর (রা.) এমনটি করেন নি। একইভাবে হযরত উসমানের খিলাফতকালে শত্রুদের এটি বলেন নি যে, নিঃসন্দেহে তোমরা অন্যায় করেছ তবে যেহেতু আমাদের ধর্ম অন্যায় ক্ষমা করার শিক্ষাও প্রদান করে, তাই আমরা তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি। বরং তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সেন দলপ্রেরণ করেন, যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধকে অব্যাহত রাখেন- এর কারণ কী ছিল? হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে বুঝা যাবে যে, এর কারণ একমাত্র এটিই ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.) জানতেন যে, যখনই বাইরের আক্রমণের আশংকা কমে আসে, তখন অভ্যন্তরীণ কোন্দল আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি এই আক্রমণকে কায়সারের আক্রমণ হিসেবে না ভেবে আল্লাহ তা'লার আক্রমণ মনে করতেন যেন মুসলমান এর মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের দিকে মনযোগ দেয় এবং নিজেদের মাঝে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে ও নুতন পরিবর্তন আনয়ন করে। হযরত উমর (রা.) জানতেন যে, রোমান সম্রাট সিজার হামলা করে নি, প্রকৃতপক্ষে এই আক্রমণ আল্লাহ্ তা'লা রচনা করেছেন যেন মুসলমানরা অলস ও উদাসীন হয়ে বস্তুবাদী না হয়ে পড়ে। বরং প্রতি মুহূর্তে তারা যেন সজাগ ও সচেতন থাকে। হযরত উসমান (রা.) জানতেন,কোন কোন গোত্র মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে নি বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা এই আক্রমণ করেছেন যেন মুসলমানরা সজাগ হয় এবং তাদের মাঝে এক নবজীবন ও নব প্রাণের সঞ্চার ঘটে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩০, পৃ: ৭৫-৭৬)

এটি মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর এক খোতবা থেকে নেওয়া। তিনি জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, বিপদ-আপদ আসে এবং সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য। উক্ত নীতিকে আমরা যদি আজও স্মরণ রাখতে চাই তবে এই সকল বিপদাপদ যা আমাদের ওপর আপতিত হয়েছে তা আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের কারণ হওয়া চাই আর পরবর্তিতে এগুলোই বিজয়ের মূল কারণ হয়ে থাকে। যদি এসব বিষয়ে আমরা শুধু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে থাকি এবং আত্মশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দিই তবে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। তবে বিপদাবলী যখন দূর হয়ে যাবে এবং উন্নতি সাধন হবে তখনও আমাদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকা উচিত। কিন্তু বর্তমানে আমাদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং আমাদেরকে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এটিই লিখেছেন যে, আমরা যদি এই বিষয়টি না বুঝি তবে প্রকৃত অর্থে আমরা কিছুই বুঝি নি এবং বর্তমানে এই বিষয়টিই প্রত্যেক আহমদীকে বুঝতে হবে।

****

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Azkarul Islam, Amaipur (Birbhum)**

১ম পাতার শেষাংশ....

ডেনমার্কের মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

গত ১৪ আগস্ট ২০২১ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ডেনমার্কের সদস্যরা ভার্চুয়াল মোলাকাতে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল।

আমরা আজকের পর্বে এই মোলাকাতের বিশেষ বিশেষ প্রশ্নোত্তর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রশ্ন: অধমের নাম সেলিমুদ্দিন। আমি গত ছয় বছর ধরে ডেনমার্কে বসবাস করছি। এখানকার সমাজব্যবস্থা পাকিস্তান থেকে একদমই আলাদা। হুযূর! আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ডেনিশ সমাজে একীভূত করে উত্তম তরবিয়ত দিতে পারি?

প্রিয় হুযূর (আই.): অবাক করা বিষয়! ছয় বছরে আপনি এটা বুঝতে পারেন নি? আমি গত ছয় বছরে এই বিষয়ে অনেক কথা বলেছি। সেগুলো আপনি শুনেছেন?

প্রশ্নকারী: জ্বী হুযূর, আমি শোনার চেষ্টা করেছি।

প্রিয় হুযূর (আই.): সমাজের সাথে কিভাবে একীভূত হতে হবে- সে বিষয়ে আমি অনেকবার কথা বলেছি। পিতা-মাতাদের বলেছি যে, সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করুন- যাতে সে বাহিরে গিয়ে যা কিছু শিখে, সে যা কিছু আলোচনা করে, যা কিছু তাকে শিখানো হয়, এখানে স্কুলে যেভাবে একদম খোলাখুলিভাবে শিক্ষকরা শিখায়, এই সকল কথা যেন আপনার সাথে সন্তান বলে। এজন্য আপনাকে সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। যখন সে আপনার সাথে কোন কথা বলবে, তখন অবশ্যই লজ্জা না পেয়ে তাকে জবাব দিবেন। এমন কিছু প্রশ্ন থাকবে যার উত্তর দিতে পাকিস্তানের সমাজ অনুযায়ী আপনার লজ্জা লাগতে পারে। এসব বিষয়ে তাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিবেন। কিছু এমন বিষয় আছে যার সম্পর্কে সন্তানদের বলতে হবে যে, তোমাদের হয়তো এই বিষয়ে স্কুলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলো শোনার মত বয়স তোমাদের হয় নি। যখন তোমরা বড় হবে তখন তোমরা এই বিষয়ে জানতে পারবে। তাদের কখনও বলবেন না যে, তোমরা ভুল করেছ। তাদের বলুন, শিক্ষক তোমাদের বলছে এতে সমস্যা নেই। কিন্তু যখন তোমরা বড় হবে তখন নিজেরাই এই বিষয়ে জানতে পারবে। যখন তোমরা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছাবে তখন তোমরা জবাব পেয়ে যাবে। তাই তাদের মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি করুন, যেন সে সব বিষয় আপনাকে বলে। আপনাদের মাঝে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে উত্তম বস্তু গ্রহণ করা শিখান। তাদের চরিত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব রাখে এবং ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী- এমন বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝান। তাদের হৃদয়ে প্রোথিত করুন যে, তারা আহমদী। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, আহমদীয়াত কী? আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। তাদের বলুন, আমরা আহমদী; আমাদের উদ্দেশ্য এবং করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে বলুন। তাদেরকে জাগতিক মানুষের বিষয়ে বলুন যে, তারা শুধুমাত্র জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর কামনা-বাসনার পিছনে ছুটছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অনেক মহান। অতএব, তোমরা সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে শৈশব থেকেই চেষ্টা কর। বাকি আনুষঙ্গিক বিষয় এবং জাগতিক বিষয়ে পরবর্তীতে তোমরা নিজেরাই জেনে যাবে। এভাবে ভাবের আদানপ্রদান হলে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে যার কারণে তারাও আপনাদের সব বলবে। কিন্তু তারা যদি ভাবে যে, আমাদের বাবা-মা আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের কোন জবাব দিবে না, তারা আমাদের প্রতি রাগ করবে, চুপ করিয়ে দিবে- তখন সমস্যা সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন: বৈশ্বিক সরকারব্যবস্থায় পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত অপরাধ দমনে সীমিত পরিসরে ব্লাসফেমী আইন কি রাখা উচিত?

প্রিয় হুযূর (আই.): এটা ব্লাসফেমী আইন রাখা বা না রাখার প্রশ্ন নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র বস্তুর, নবীদের এবং ঐশী কিতাবের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। মানবসৃষ্ট আইন এগুলো পরিবর্তন করতে পারবে না। মূল বিষয় হল, তাদের বলতে হবে যে, তোমরাই বলে থাক, অন্যের আবেগের সম্মান করা উচিত। সকল স্তরে তোমরা মানুষের আবেগের সুরক্ষার জন্য আইন পাস করেছ। আবার তোমরাই বলে থাক যে, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। সকলের তার মত স্বাধীনভাবে প্রকাশের অধিকার রয়েছে। আর যদি এটি স্বাধীনতা হয়ে থাকে, তাহলে কারও মতামত যখন অন্যকে আঘাত করে তখন মতামত প্রকাশের সীমারেখা থাকা উচিত। স্বাধীনতার অর্থ এটি নয় যে, তোমরা মানুষের পকেট মারবে অথবা ছিনতাইকারী হয়ে যাবে। স্বাধীনতার মানে এটি নয় যে, তোমরা কারও ঘরে হামলা করে জিনিসপত্র চুরি করবে। এটি কখনও স্বাধীনতা হতে পারে না। এমন করলে আইন শাস্তি দেয় না? একইভাবে তোমরা যে শাস্তিই নির্ধারণ কর না কেন, সেটা হোক ব্লাসফেমী বা অন্যকিছু; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমপক্ষে এই আইন পাস কর যে, একজন নাগরিককে অবশ্যই অন্যের আবেগ অনুভূতির সম্মান করতে হবে। আর যে সমাজে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির সম্মান করা হয়, সেখানে আপনাআপনি একটি স্থায়ী শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যখন শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কেউ অন্যের আবেগ অনুভূতি নিয়ে হাসি-তামাশা করবে না। এটাই মূল বিষয় যা পৃথিবীবাসীকে বোঝাতে হবে। এছাড়া ব্লাসফেমীর জন্য আল্লাহ্ তো কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা ভাই-ভাই হয়ে থাক। একটু আগেই আপনারা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতে শুনেছেন- 'তোমরা পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান কর।' যদি এই আইন আমরা সবাই মান্য করতে পারি, তাহলে আমাদের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। যদি সবাই এই আইন বাস্তবায়ন করতে পারে যে, শুধুমাত্র অধিকার আদায় নয় বরং অন্যদের অধিকার প্রদান করাও আমাদের কাজ। যদি এই বিষয়টি সকল নাগরিক অনুধাবন করে, তবে এটিই আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেবে। দুই বছর আগে ২০১৯ সালের জলসায় আমি অনেক অধিকারের কথা বলেছি। এবছরও কিছু অধিকারের কথা বলেছি। যদি একজন এসকল অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেয় তাহলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। তখন ব্লাসফেমী আইন প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কোন আইন থাকারও দরকার নেই।

মূল বিষয় হল, পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান করা। এই বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করা উচিত এবং বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা হলে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং প্রেমপ্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যখন এমন পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন মানুষ একে অন্যের আবেগ নিয়ে খেলবে না, হোক সেটি ধর্মীয় অনুভূতি বা ব্যক্তিগত অনুভূতি।

প্রশ্ন: কখনও যদি এমন সময় আসে যখন দাজ্জালী শক্তি আহমদী জামা'তের সাথে যুদ্ধ করবে। আর যদি এমন হয় তাহলে আহমদীদেরও কি যুদ্ধ করতে হবে?

প্রিয় হুযূর (আই.): বিষয় হল, যখনই কোন সরকার বা জাতি ধর্মকে নির্মূল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে তখন আহমদীদের যুদ্ধ করা বা জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ঈসা মসীহ্ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। ইলতিওয়া মানে হল প্রলম্বিত করা, কিছু সময়ের জন্য রহিত করা। ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। এখন ধর্মের বিনাশের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার করার মত পরিস্থিতি নেই। যখন ধর্মের বিনাশ করার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার হবে তখন মুসলমানদের জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। আর তখন আহমদীদের সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী হতে হবে। কিন্তু এটি শুধুমাত্র ধর্মের খাতিরে। কিন্তু বর্তমানে যেসব যুদ্ধ করা হচ্ছে সেগুলো সব ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধ। আর তাতে স্বয়ং মুসলমানরা অন্যদের ধর্ম গ্রহণ করছে। মুসলমানরাই অমুসলিমদের থেকে অস্ত্র ক্রয় করছে। মুসলমানরাই মুসলমানদের হত্যা করছে, তা-ও অন্যদের সহায়তায়। জিহাদ কীভাবে হল? আজকের জিহাদকে কি জিহাদ বলা যায়?

অতএব, এই যুগ কলমের জিহাদের যুগ। যেভাবে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের ব্যাপারে বুখারী শরীফে লিখা আছে, ইয়াযায়ুল হারব অর্থাৎ যুদ্ধ রহিত হবে। কেননা দাজ্জালী শক্তি এবং অন্য ধর্মীয় নেতারা সাহিত্য, লেখনী এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আর এর জবাবে এসব মাধ্যমই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখনও বলেন নি যে, জিহাদ একদম বিলুপ্ত হবে। তিনি বলেছেন, যারা এই কথা শোনার পরও যুদ্ধ করবে তারা অবিশ্বাসীদের কাছে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবে। যে কাফির তোমার ধর্মের বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, তাদের বিরুদ্ধে যদি তোমরা জাগতিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই পরাজিত হবে। আর দেখুন, এখন ঠিকই মুসলমানরা মার খাচ্ছে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে। হ্যাঁ অবশ্যই! তিনি বলেছেন, ঈসা মসীহ্ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। আর সেই অবস্থা-পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তিনি সত্য সত্য ধর্মযুদ্ধকে রহিত করেছেন। দোয়া করুন সেই অবস্থা যেন সৃষ্টি না হয়। আর যদি সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে আহমদীদের যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। কেননা তখন শত্রুরা ধর্মকে বিনাশ করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে যুদ্ধ করার যে অনুমতি দিয়েছেন তা প্রথমবারের মত সূরা হজ্জে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 4 Nov, 2021 Issue No.44

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১ম পাতার শেষাংশ...)

শত্রুদের বিনাশেরও দলিল।

এটি কিয়ামতের দলিল এভাবে যে মানুষের জীবন যদি ইহজগতেই শেষ হয়ে যেত, তবে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করেছেন মানুষ যেন সে এই পৃথিবীতে কিছুকাল ভোগবিলাস করার পর মৃত্যুবরণ করে। এমন চিন্তাধারা একেবারেই অযৌক্তিক। এমন সুবিশাল ব্যবস্থাপনা সৃষ্টির পিছনে এক মহান উদ্দেশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু এই পৃথিবীতেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেখা যায় না। কাজেই এর জন্য আবশ্যক হল মানুষের জীবন ইহজগতেই যেন শেষ না হয়ে যায়, বরং এই ব্যবস্থাপনার বিশালতা অনুসারে এর কালের ব্যপ্তিও যেন সুবিশাল হয়, যেখানে সে এমন এক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে যা এই সুবিশাল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে যে সমগ্র ব্যবস্থাপনা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা তুচ্ছ তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেই এমন সব রহস্যাবলী নিহিত রেখেছেন যা গুণে শেষ করা যায় না। মানব দেহকেই যদি ধরা হয় তবে দেখা যাবে যে, মানবদেহতন্ত্র ভীষণরকমের জটিল। হাজার হাজার চিকিৎসাবিদ এবং গবেষক এর গুঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য প্রচেষ্টারত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন সমস্ত কিছু তারা আজও আয়ত্ত করতে পারে নি। কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পর ইউরোপবাসী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানব দেহের সমস্ত কিছু আয়ত্ব করতে পারে নি। এছাড়া এমন সুবিশাল ব্যবস্থাপনার ভিত্তি যার উপর রাখা হয়েছে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন নগণ্য হিসেবে বর্ণনা করাকে কিভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতে পারে, যেমনটি কিয়ামত দিবসের অস্বীকারকারীরা দাবি করে থাকে?

অনুরূপভাবে এই ব্যবস্থাপনা নবীগণের সফলতা এবং তাঁদের শত্রুদের বিনাশকেও নির্দেশ করে। পৃথিবীকে যদি আকাশ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়, তবে তার অবস্থা কি দাঁড়াবে? একদিনও তা টিকে থাকতে পারবে না। তাই যারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিক আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবিত থাকবে, তারা কেমন অন্ধ? যেভাবে এই পরিপূর্ণ ব্যবস্থপনার অংশ হিসেবেই পৃথিবীর নিরাপদ থাকতে পারে, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার অংশ হলে তবেই মানুষ বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে

(১১ পাতার শেষাংশ...)

পারে। অন্যথায় তার রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। বিশেষ করে সে যখন এই ব্যবস্থাপনার উপর আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে, তখন তার নাজাত একেবারেই অসম্ভব। অতএব, নবী করীম (সা.)-এর অস্বীকারকারীদের বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আকাশ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে তাদের বাহ্যিক উপকরণসমূহ কোন কাজে আসবে না। বরং এখন তাদের বিনাশ এবং মুসলমানদের উন্নতির সময় এসছে।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:১০৭)

****

কেননা তারা এখন সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা ধর্ম বিনাশ করার চেষ্টা করছে। এখন যদি তাদের প্রতিহত করা না হয় তাহলে কোন সীনাগগ, চার্চ, মন্দির বা মসজিদ বাঁচবে না। পবিত্র কুরআন সকল ধর্মের উপসনালয়ের নাম বর্ণনা করেছে। এসকল উপসনালয় সুরক্ষিত থাকবে না তাই যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, ধর্মের বিরুদ্ধে যখন কোন যুদ্ধ হবে শুধুমাত্র তখনই ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইসলামে কখনও ভৌগলিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি। আর কখনও এই উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যুদ্ধ করে নি। নৈরাজ্য দূর করতে যুদ্ধ করা হয়েছে। কখনও জাগতিক বা ভৌগলিক স্বার্থের জন্য ইসলামে যুদ্ধ করা হয় নি। কমপক্ষে মহানবী (সা.)-এর কোন খলীফা কখনও করেন নি। পরবতীতে মুসলিম বাদশাহ্রা খলীফা উপাধি নিয়ে এমন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তখন এই ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন ছিল না। ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত ছিল। ইসলামী শিক্ষার বাস্তবিক প্রয়োগ এরপর ছিল না। এরপর যুদ্ধ হতে থেকেছে, কিছু বৈধ যুদ্ধও হয়েছিল আবার কিছু অবৈধও ছিল। তাই শুধুমাত্র নৈরাজ্য দূর করতে যুদ্ধ করা বৈধ। এজন্য সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ বলেছেন, যদি দুটি জাতি যুদ্ধ করে, তুমি তাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর। আর যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন তাদের সাথে ন্যায়বিচার কর। যদি কোন জাতি অন্য জাতির সাথে সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তুমি সীমালঙ্ঘনের প্রতিবাদ কর। কিন্তু যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাদের ওপর কোন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ কর না। যেভাবে আজকের পৃথিবীতে হচ্ছে। যুদ্ধের পরে তাদের দেশ পরিচালনায় স্বাধীনতা দেয়া উচিত। তারা নিজেদের মত দেশ পরিচালনা করুক, উন্নতি করুক।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কী হয়েছিল? দেশসমূহকে বিভক্ত করে দেয়া হয় যাতে তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে একত্র না হয়। এটি ন্যায়বিচার ছিল না। দাজ্জালী শক্তি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় না করতে পারে। তখন থেকেই নৈরাজ্য আর সংঘাত লেগেই আছে, যা দিন দিন বেড়ে চলছে। তারা এখন নিজেরাই দাজ্জালের সাথে মিলে আছে। যুদ্ধ কী করবে- মুসলমানরাই দাজ্জালের সাথে মিলে আছে।

প্রশ্ন: হুযূর, আপনি সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন। তারা কী কী বিষয়ে স্বামীর কাছে দাবি করতে পারে- সে বিষয়ে বলেছেন। একইভাবে স্বামী হিসেবে একজন পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী- সেটি স্পষ্ট করেছেন।

হুযূর! একজন নারীর তার স্বামীর এবং তার পরিবারের প্রতি কী দায়িত্ব রয়েছে? পুরুষের তার স্ত্রীর প্রতি কী অধিকার রয়েছে?প্রিয় হুযূর (আই.): প্রথম বিষয় আপনি বলেছেন "আজকাল আপনি নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন।" আজকাল আমি তো নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছি না। আমি আজকাল ইসলামী ইতিহাস ও বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে খুতবা দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন, আমার সাম্প্রতিক জলসা সালানার বক্তৃতায় আমি নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলেছি। আপনি যদি নারীদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নির্দেশনামূলক পূর্বের আমার কথা ছেড়ে কেবলমাত্র এই বক্তৃতার কথা ধরে বসেন, যদি আপনি এই বক্তৃতাই মনোযোগ দিয়ে শুনেন; তবে আমি অবাক হচ্ছি মানুষ হয়তো মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে নি। আর যেহেতু কিছু বিষয় স্পষ্টভাবে তাদের পক্ষে গেছে, নারীরা তাই শুধুমাত্র সেগুলো গুরুত্ব দিয়েছে। আমি এই বক্তৃতায় নারীদের দায়িত্ব নিয়েও কথা বলেছি। আমি বিস্তারিত হাদীসের সারাংশ উপস্থাপন করেছি; যেখানে এক নারী মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে পুরুষরা নামায পড়ে, আর্থিক কুরবানী করে, আয় করে, এরপর জিহাদ করে এবং হজ্জ করে। আর নারীরা এমন কাজ করতে পারে না। তাই নারীরা কীভাবে ঘরে বসে একই পুরস্কার পেতে পারে, যেভাবে পুরুষরা জিহাদে গিয়ে লাভ করে। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ! তোমরাও একই পুরস্কার পেতে পার। এখানে এটা বলা হয় নি যে, পুরুষের কোন অধিকার নেই। এখানে বলা হয়েছে, নারীর পুরস্কার পুরুষের সমান। নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং সমান পুরস্কার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ অনেকবার বলেছেন, নারী ও পুরুষকে তার সৎকর্মের জন্য উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। নারী এবং পুরুষ সমান প্রতিদান লাভ করবে। এমনকি নারী ও পুরুষ উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই মহিলা এটাও বলেছিল যে, তারা ঘরের দেখাশুনা করে। এর মানে হল, তারা যখন ঘরের দেখাশুনা করবে তখন পুরস্কার লাভ হবে। যদি কেউ এই হাদীসে মনোযোগ দেয় তাহলে সে দেখবে যে, সেই নারী বলেছিল যে, সে ঘরের দেখাশুনা করে অর্থাৎ সে দায়িত্ব পালনকারী একজন নারী। সে সন্তানের লালনপালন করে এবং তাদের উত্তম তরবিয়ত দেয়। এক কথায় সে স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। ঘরে স্বামীর সম্পদের সুরক্ষা করে। স্বামীর সম্মান ও মর্যাদার সুরক্ষা করে। অর্থাৎ সে স্বামীর বিশ্বস্ততা রক্ষা করে এবং সে স্বামীর অধিকার আদায়কারী একজন নারী। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি তুমি এইসকল কাজ কর, তাহলে তোমরাও পুরুষের জিহাদ, হজ্জ এবং তাদের ইবাদতের সমান পুরস্কার লাভ করতে পারবে। এভাবে এই হাদীসে নারীদেরও উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা এই কাজ করলে পুরস্কার লাভ করবে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: **Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir